আল-বাতুল

রবিউল আউয়াল সংখ্যা, ১৪৪২

অনন্য তওবা
সচেতন নারী সমাজের গর্ব
নবী-নন্দিনী
সিদ্দিকাহ (রা.)'র দৃঢ়তা

আল-বাতুল

১ম সংখ্যা, রবিউল আউয়াল, ১৪৪২ হিজরি

সম্পাদক
সালমন সালমা

সহকারী সম্পাদক
সারাহ নাজ ফাতিমা
ফারিহা আরফিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
কাজী আসিফ আশরাফী
আসিফ উল আলম সৈকত
মুহাম্মদ হোসাইন রেজা

নিরীক্ষণ
মোহাম্মদ আবদুল কাহ্হার

প্রচ্ছদ
আ ল ম হুমাইর কাইসান

অঙ্গসজ্জা
মুহাম্মদ সাইফ উদ্দীন আরিফ

সম্পাদকীয়

সময়ের নির্দিষ্ট গতি আছে। চলার ধরণ আছে। এই গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। থামানো তো অসম্ভব। পর্যবেক্ষণ করতে হয়, নিবিড় পর্যবেক্ষণ। বুঝতে হয় তার গতি। জানতে হয় তার প্রতিটি বাঁক। তারপর করতে হয় তার অনুসরণ। অবস্থার প্রেক্ষিতে করতে হয় গতি পরিবর্তন। বাঁকে বাঁকে পথ ঘুরিয়ে নিতে হয়। তাল মিলিয়ে চলতে হয় সময়ের সাথে। তাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। তাই বুঝতে হয় তার চাহিদা কী? মানুষকে মানিয়ে নিতে হয়, চালিয়ে নিতে হয় সময়ের চাহিদানুযায়ী। তাই তো বলা হয়, "সময়ের চাহিদা যে বুঝে না, সে নিরেট মূর্খ।"

আজ সময়ের গতি দ্রুত। রুচিসম্মত-তথ্যসমৃদ্ধ। এই গতি রোধের সাধ্য নেই কারো। মানিয়ে চলা ভিন্ন উপায় নেই। আজ সময় জ্ঞানের সমৃদ্ধি চায়। গবেষণা নামক চিন্তার গভীরতা চায়। আজ জ্ঞানে-কর্মে যে সমাজ যত বেশি দক্ষ, সে তত বেশি সম্মানিত, সমৃদ্ধ। ঠিক এই সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যই ইসলামে প্রভুর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আদেশ হলো, "পড়ো"। পরিতাপের বিষয় হলো, যদিও ইসলামের শুরু হয় 'পড়ো' প্রত্যাদেশের মাধ্যমে, কিন্তু আজ মুসলিম সমাজ 'পড়া' হতেই সবচেয়ে দূরে। যাও ক'জন আছেন সেখানে নারীদের অবস্থান নেই সমান। তথ্যসমৃদ্ধির এই যুগে জ্ঞান-গবেষণার জন্য যেখানে পুরুষদের খোঁজ পাওয়াটাই দুষ্কর, সেখানে নারীদের কথা চিন্তা করা বাতুলতা বৈ কি। তবুও যুগের চাহিদাকে সম্মান করে, বাতুলতাকে স্বীকার করেই আমাদের ক্ষুদ্র প্রায়শ এই মুহূর্তে আপনাদের হাতের স্পর্শে থাকা **'আল-বাতুল'**।

জ্ঞান-কর্মে সাজানো **'আল-বাতুল'**-এর পেছনে যারা শ্রম দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন কিংবা জ্ঞান- বুদ্ধি দিয়েছেন প্রত্যেকের প্রতিই আমরা কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতেও আপনাদের সহযোগিতা পাব বলে আশা করছি। ভুল-ত্রুটি সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, পরিপূর্ণ একমাত্র রাব্বে কা'বা এবং নিখুঁত কেবল তারই সৃষ্টি। ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে পেশ করলাম আমাদের অঙ্গনের ইসলামি বোনদের আয়োজনে আমাদের অঙ্গনের প্রথম ম্যাগাজিন **'আল-বাতুল'**।

সূচী

ফা যা য়ে ল

মাইমুনা শরীফ জুসা : জিকিরের ফযিলত

ফারিহা আরফিন : দরুদ-এ-মোবারাকা ও সালামের ফযিলত

নাছরিন আকতার : রবিউল আউয়াল ও দরুদ শরীফ পাঠ

রাহনুমা নাছরিন : কুরআনের আলোকে 'ইন-শা-আল্লাহ' বলার ফজিলত

সি রা ত

মারিহা জান্নাত ইসলাম তানহা : মুনাফিক সর্দার এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ

হে দা য় ত - ত রী

সালমন সালমা : নবি-নন্দিনী

পছন্দের লিখাটি পড়তে
শিরোনামের উপর ক্লিক করুন

মু মি ন - জ ন নী

তাহসিন জান্নাত তাবাসসুম : সিদ্দিকাহ ﵂'র দৃঢ়তা

স মু জ্জ ল তা র কা

সাইয়্যিদাহ ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ : অনন্য তাওবাহ

উ ত্ত ম র ম নী

সাদিয়া আক্তার : পূণ্যবতী কতিপয় রমণী

প্র ব ন্ধ

খায়রাতুন বিনতে বাবুল মিথিয়া : সায়েন্স ফিকশনের গোড়াতে মুসলিমদের কৃতিত্ব

নূরে জান্নাত নাছরিন : ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা

আ ত্ম শু দ্ধি

জিনাতুননেছা জিনাত : সচেতন নারী সমাজের গর্ব

ছালেহা দেওয়ান : রাহে ইশ্‌ক

ক বি তা

জোয়াইরিয়া বিনতে আজিজ : মরুর দুলালের আগমনী

সাদিয়া জান্নাত মুনমুন : নুর নবিজির আগমন

লাফিফা নূর ইতি : নবি তুমি আসছো ধরায়

জান্নাতুল মাওয়া সাঈমা : বসুমতীর কৃতজ্ঞতা

কুনছুমা বাবর মুন্নি: আঁধারে ধরণী

ধা রা বা হি ক

বিশেষ পদ্ধতিতে তাজবিদ শিক্ষা

জিকিরের ফজিলত

মাইমুনা শরীফ জুসা

জিকির মানেই আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনন্য এক উপায়। একজন মু'মিন নামাযের পাশাপাশি আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে যেতে যিকির অন্যতম। মহান আল্লাহ বলেন :

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"[১]

আল্লাহ আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশি বেশি করে স্মরণ কর। [২] আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

আর আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও নারী আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।[৩]

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

"তোমার প্রভূকে স্মরণ কর মনে মনে বিনীতভাবে কাকুতি, মিনতি করে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) আর তোমরা উদাসীনদের অর্ন্তভুক্ত হয়ো না।"[৪]

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন (গাফেল) না করে। যারা উদাসীন ও গাফেল হবে, তারাইতো প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।"[৫]

কুরআনে বলা হয়েছে:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

"যে ব্যক্তি আমার যিকির থেকে বিমুখ থাকবে তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।"[৬]

কুরআনে আরো বলা হয়েছে:

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখ, আল্লাহর যিকিরেই আত্মসমূহ শান্তি লাভ করে।"[৭]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা ﵂ থেকে নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»

হযরত আয়েশা ﵂ বলেন, রাসূল ﷺ সব সময় আল্লাহর যিকির করতেন।[৮]

হযরত ইবনে ওমর ﵁ থেকে বর্ণিত:

عَنْ إبن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجَنَّةِ فَارْتَعُوا» قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: «حِلَقُ الذِّكْرِ». وَ إِنَّ للهِ تَعَالَى سَيَّارَاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُوْنَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْ عَلَيْهِمْ حَفُّوْابِهِمْ-

হযরত ইবনে ওমর ﵁ থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখন বেহেশতের বাগান সমূহের পাশ দিয়ে যাবে, তখন খুব ভালো করে তার ফল খাবে। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতের বাগান কি? রাসূল ﷺ বললেন, 'যিকিরের হালকা' (অর্থাৎ বেহেশতের বাগান হচ্ছে যিকিরের মজলিশ)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার রয়েছে ফিরিশতাদের পরিভ্রমণকারী দল যারা যিকিরের মজলিশ খুঁজে বেড়ান। আর যখন

---

১. সুরা বাকারা: আয়াত-১৫২
২. সুরা আহযাব : আয়াত- ৪১
৩. সুরা আহযাব : আয়াত- ৩৫
৪. সুরা আ'রাফ : আয়াত- ২০৫
৫. সুরা মুনাফিকুন : আয়াত- ৯
৬. ত্বোহা : আয়াত- ১২৪
৭. সুরা রা'আদ : আয়াত-২৮
৮. সহিহ বুখারি, ১/১২৯ পৃষ্ঠা, সহীহ মুসলিম, ১/২৮২ পৃষ্ঠা

তাঁরা এসব মজলিসে উপনীত হন তখন যিকিরকারীদের ঘিরে ফেলেন।[৯]

তিরমিযির এক রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত বেহেশতের ফল খাবে এর জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ :

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

"[সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামুদলিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর] এই তাসবীহ পাঠ করার কথা বলেছেন।"[১০]

রাসূলে পাক (ﷺ) ফরমান:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيٍّ إِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ القِيَامَةِ-

"হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোন দল কোন বৈঠক, মজলিস কিংবা সভা সমিতিতে বসে আর সেখানে আল্লাহকে স্মরণ না করে (আল্লাহর যিকির না করে) এবং নবি করীম ﷺ এর ওপর দুরূদ না পড়ে তাহলে তা হবে তার জন্য কিয়ামত দিবসে আফসোস ও অনুশোচনার বিষয়।"[১১]

আবু সাঈদ খুদরী ﵁ থেকে বর্ণিত:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ»

"রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা এত বেশি আল্লাহর যিকির কর যেন লোকেরা তোমাদেরকে পাগল বলে।"[১২]

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হায়েজ (খতুস্রাব), নেফাস (প্রসব স্রাব), জানাবত ও স্ত্রী সহবাস এবং স্বপ্নদোষ প্রভৃতি নাপাক ও অপবিত্র অবস্থায় তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), দুআ, দুরূদ ইত্যাদিত মনে মনে ও জবানী করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ওলামাদের ইজমা ও ঐক্যমত হয়েছে। কিন্তু হায়েজ, নেফাস ও জানাবত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম।

৯. তিরমিযি, ৫/৫৬২, হাদিস-৩৫১০
১০. তিরমিযি, ৫/৪১২ পৃষ্ঠা, হাদিস ৩৬০৯
১১. তিরমিযি, ৩/১৪০, মুসনাদে আহমদ, ১৬/৪৩ পৃষ্ঠা
১২. মুসতাদরাক লিল হাকেম, ১ম খণ্ড, ৬৭৭ পৃষ্ঠা, হাদিস, ১৮৩৯

দরূদ-এ মোবারাকা ও সালামের ফযিলত

ফারিহা আরফিন

দরূদে পাকের ফযিলতের ব্যাপারে স্বয়ং নবি আকরাম ﷺ থেকে বহু সংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে এ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আমলের গুরুত্ব ও ফযিলত প্রকাশ পায়। নিচে এ সংক্রান্ত কিছু হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হলো:

(১) হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত নবি আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন:

« مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا »

-"যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করল, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন"[১৩]

• ইমাম তিরমিযী رحمه الله এ বর্ণনার সাথে যুক্ত করেন, দরূদ শরীফ পাঠের কারণে তার জন্য দশটি নেকি লিপিবদ্ধ করে দেন।[১৪]

(২) হযরত আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত নবি আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন:

« مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ »

-"যে ব্যক্তি আমার ওপর একরাব দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করেন, তার দশটি গুনাহ মুছে দেন এবং তার দশটি স্তর সমুন্নত করে দেন"।[১৫]

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত নবি আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন:

« أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً »

-"কিয়ামতের দিবসে ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) আমার প্রতি সর্বাধিক দরূদ শরীফ পাঠ করেছে"।[১৬]

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন সায়িব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত নবি আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন:

« إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ »

-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যারা যমিনে পরিভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেন"।[১৭]

(৫) হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত নবি আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»

-"(আমার উম্মতের মধ্য থেকে) যে ব্যক্তিই আমার ওপর সালাম পেশ করে, আল্লাহ তায়ালা তার সালাম আমার রূহে পৌঁছে দেন, এমনকি আমি তার সালামের উত্তর দিয়ে থাকি"।[১৮]

(৬) হযরত হাসান বিন আলী عليه السلام থেকে বর্ণিত নবি আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন:

« حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ، فَأَنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ »

–"তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার ওপর দরূদ পাঠ কর; কেননা তোমাদের দরূদ অবশ্যই আমার নিকট পৌছানো হয়"।[১৯]

---

১৩. সহিহ মুসলিম, ১/৬০৩, হাদিস নং: ৪০৮
১৪. সুনানে তিরমিযী, ২/৩৫৩-৩৫৪, হাদিস নং: ৪৮৪-৪৮৫ ।
১৫. সুনানে নাসাঈ, ৪/৫০, নং: ১২৯৭।
১৬. সুনানে তিরমিযী, ২/৩৫৪, ৪৮৪। সুনানুল কুবরা, ৩/২৪৯, ৫৭৯১।
১৭. সুনানে নাসাঈ, ৩/৪৩, ১২৮২। বাইহাকী, ২/২১৭, ১৫৮২।
১৮. আবু দাউদ, সুনান, ২/২১৮, ২০৪১। বাইহাকী, ৫/২৩৫, ১০০৫০।
১৯. আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ২/৩৬৭, হাদিস নং: ৮৭৯০।

(৭) ইমাম নাসাঈ হযরত আবু তালহার একটি হাদিস বর্ণনা করেন যে, হুযুর আকরাম ﷺ একদা আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন, তাঁর চেহারা মুবারকে আনন্দের ঝিলিক, হুযুর আকরাম ﷺ ইরশাদ করলেন:

« إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ عليه السلام ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ فَقَالَ: أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ، أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا»

"আমার নিকট হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আগমন করেন এবং বলেন, আপনার প্রতিপালক ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি কি এ কথার ওপর সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আপনার ওপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি তার ওপর দশটি রহমত বর্ষণ করব। আর যে ব্যক্তি আপনার সমীপে একবার সালাম পেশ করবে আমি তার ওপর দশটি শান্তি বর্ষন করব"।[২০]

হযরত ফুযালা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, একদা রাসুলে আকরাম ﷺ উপবিষ্ট ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আসল এবং নামায পড়ে এ বলে দোয়া করল যে, 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার ওপর অনুগ্রহ কর।' নবি আকরাম ﷺ তাকে ডাকলেন এবং বললেন, হে নামাযী! তুমি তাড়াহুড়া করেছ। যখন তুমি নামায পড়বে তখন বসবে, আল্লাহ তায়ালা যেমন তেমন করে তাঁর প্রশংসা করবে, আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে অতঃপর দোয়া করবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আরেক ব্যক্তি আসল, নামায পড়ল, আল্লাহ তায়ালার গুণগান করল, হুযুর আকরাম ﷺ এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করল। হুযুর আকরাম ﷺ তাকে বললেন, "হে নামাযী! তুমি দোয়া কর, তোমার দোয়া কবুল করা হবে"।[২১]

(৮) হযরত ওমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه বর্ণনা করেন:

« إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »

-"দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যস্থানে ঝুলন্ত থাকে, এর মধ্য থেকে কোন কিছুই উপরে পৌঁছে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি স্বীয় নবি আকরাম ﷺ ওপর দরূদ পাঠ করবে"।[২২]

(৯) এ বিষয়ে ইমাম বায়হাকী হযরত আলী আলাইহিস সালাম থেকে ও একটি হাদিস উল্লেখ করেন। হাদিসটি নিম্নরূপ-

«كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ »

-"সকল দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরালে থাকে (অর্থাৎ কবুল হয় না) যতক্ষণ পর্যন্ত না তার (শুরুতে ও শেষে) হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার পরিজনের ওপর দরূদ শরীফ পেশ করা হয়ে থাকে"।[২৩]

(১০) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, হুযুর আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন:

« مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً »

-"যে ব্যক্তি নবি আকরাম ﷺ'র ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার ওপর (রহমতের আকারে) সত্তর বার দরূদ শরীফ প্রেরণ করেন"।[২৪]

২০. নাসাঈ, সুনান, ৩/৫০, ১২৯৫। মুসনাদ, ৪/২৯, হাদিস নং: ১৬৪০৮।
২১. তিরমিযী, সুনান, ৫/৫১৬, হাদিস নং: ৩৪৭৬।
২২. তিরমিযী, সুনান, ২/৩৫৬, হাদিস নং: ৪৮৬।
২৩. বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, ২:২১৬, হাদিস নং-১৫৭৫।
২৪. আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ২:১৭২- ১৮৭, হাদিস নং-৬৬০৫-৬৭৫৪।

(১১) হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, হুযুর আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন:

«مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ، فَتَفَرَّقُوا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

-"যখন কিছু লোক কোন মজলিসে একত্রিত হয় অতঃপর সে মজলিস থেকে) আল্লাহ তায়ালার যিকির ও নবি আকরাম ﷺ'র ওপর দরূদ শরীফ পাঠ না করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন কিয়ামতে দিবসে এটি তাদের পরিতাপের বিষয়ে পরিণত হবে"।[২৫]

(১২) সহিহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত হুযুর আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন:

«مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ، فَتَفَرَّقُوا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

-"যখন কোন সম্প্রদায় কোন মজলিসে বসে এবং সে মজলিসে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে না এবং নবি আকরাম ﷺ'র ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করে না; তখন সে মজলিসটি কিয়ামতের দিবসে পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। যদি তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে"।[২৬]

(১৩) হযরত আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, হুযুর আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِائَةً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةً كَتَبَ اللهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ، وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَأَسْكَنَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ»

-"যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর একশবার রহমত নাযিল করবেন, আর যে ব্যক্তি আমার ওপর একশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার দুই চক্ষুর মধ্যখানে (কপালে) নিফাক ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিপিবদ্ধ করে দিবেন এবং কিয়ামতের দিবসে শহীদদের সাথে স্থান দিবেন"।[২৭]

(১৪) ইমাম ইবনু আবি শাইবা এবং আবু ইয়ালা স্বীয় সনদে হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুর আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন:

«صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ»

-"তোমরা আমার ওপর দরূদ শরীফ পাঠ কর। নিঃসন্দেহে আমার ওপর (তোমাদের) দরূদ পাঠ তোমাদের (দৈহিক ও আত্মিক) পরিশুদ্ধির উপলক্ষ"।[২৮]

(১৫) হযরত আবু দারদা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হুযুর আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْرًا، أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ»

-"যে ব্যক্তি সকালে দশবার এবং বিকেলে দশবার আমার ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে কিয়ামতের দিবসে সে আমার শাফায়াত লাভ করবে"।[২৯]

২৫. ইবনু হিব্বান, সহীহ, ২/৩৫১, হাদিস নং-৫৯০।
২৬. ইবনু হিব্বান, সহীহ, ২/৩৫২, হাদিস নং-৫৯১।
২৭. তাবরানী, মুজামুল আওসাত, ৭/১৮৮, হাদিস নং-৭২৩৫।
২৮. ইবনু আবি শাইবা, মুসান্নাফ, ২/২৫৩, হাদিস নং-৮৭০।
২৯. মুনযিরী, তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১/২৬১, নং-৯৮৭।

রবিউল আউয়াল ও দরুদ শরীফ পাঠ

নাছরিন আকতার

ইসলামি বর্ষপঞ্জিকার তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল। আরবিতে ربيع শব্দের অর্থ 'বসন্ত' আর الاول অর্থ 'প্রথম'। উক্ত নাম থেকেই স্পষ্ট যে মাসটি হচ্ছে বসন্তের ন্যায়। কেননা এই মাসে আল্লাহর প্রেরিত হাবিব হজরত মুহাম্মদ ﷺ জন্ম গ্রহণের মাধ্যমে এই ধরনীকে উজ্জ্বল করে। আবার এ মাসেই তিনি তাঁর ওপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব পালন শেষে নিজ প্রভুর আহবানে সাড়া দিয়ে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং মহান আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে গমন করেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ মাস। রবিউল আউয়াল বিশ্ব-মুসলিমের আবেগ-অনুভূতি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সিক্ত ঐতিহাসিক স্মরণীয়-বরণীয় মাস। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাসুল ﷺ মানবতার জন্য আদর্শ শিক্ষক। তার জীবনাদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণের পাশাপাশি তার প্রতি দরুদ পাঠ করা প্রত্যেক ঈমানদারের অবশ্য কর্তব্য।

এই মাসে রাসুলের ওপর দরুদ পড়ার গুরুত্বও অনেক। درود একটি ফার্সি শব্দ। হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং সহচরদের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া ও শান্তি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করাই দরুদ।

আল্লাহ তা'আলা সুরা আহজাবের ৫৬ নং আয়াতে রাসুল ﷺ এর প্রতি দরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন;

إِنَّ اللهَ وَمَـــلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَـا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَـــلُّوْا عَلَـــيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবির প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমার তার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।"

দরুদ পাঠের গুরুত্বারোপ করে রাসুল ﷺ বলেছেন:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ». رواه الإمام أحمد والنسائي

"হজরত আনাস বিন মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন এবং তার দশটি সগীরা গুনাহ মাফ করা হয়, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।"

নবি কারিম ﷺ এর প্রতি দরুদ পাঠ করলে যেমন মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় তেমনি অবহেলা করলে তিরস্কার এর উপযুক্ত হয়। এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন:

وعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: رَغِم أَنْفُ رجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عليَّ رواهُ الترمذي.

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন,"লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয় কিন্তু সে আমার ওপর দরুদ পাঠ করে না।" অপর এক বর্ণনায় রাসুল ﷺ বলেছেন, "কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হবে যে আমার প্রতি বেশী বেশী দরুদ পাঠ করে।"

দরুদ পাঠ আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির এক বিশাল মাধ্যম, প্রশান্তি লাভের সহজ উপায়। এটি এমন আমল যা সর্বদা কবুল হয়। নবি কারিম ﷺ'কে ভালবেসে শ্রদ্ধার সহিত তার ওপর দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। দরুদ পাঠের অনেক উপকারিতা রয়েছে। আমরা মা-বোনেরা আমাদের অবসর সময়ে বেশি বেশি দরুদ পাঠের চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে বেশি বেশি দরুদ পাঠের তাওফিক দান করুন। আমিন।

কুরআনের আলোকে "ইন-শা-আল্লাহ" বলার ফজিলত

রাহনুমা নাছরিন

'ইন-শা-আল্লাহ' অর্থ- যদি আল্লাহ চান। ভবিষ্যতে কোন কাজ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা হলে আমরা এ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু 'ইন-শা-আল্লাহ' শব্দের যথাযথ অর্থ ও ব্যবহার এবং এর ব্যবহারের গুরুত্ব না জানার কারণে 'ইন-শা-আল্লাহ' বলা ছাড়াই প্রতিনিয়ত অনেক কথা বলে বসি যা আমাদের অজানা ভুলের কারণে বাস্তবায়িত হয়না। স্বয়ং নবি করিম ﷺ তাঁর বরকতময় জীবনে অজ্ঞাতসারে 'ইন-শা-আল্লাহ' ব্যবহার না করার কারণে ১৫ দিন যাবত আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাযিল হয়নি। ঘটনার বর্ণনা রয়েছে পবিত্র কুরআনের অন্যতম সুরা 'আল-কাহফ'-এ আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর কাছে 'আসহাবে কাহফ'বা গুহাবাসী কয়েকজন যুবক-এর ঘটনা জিজ্ঞেস করায় তিনি ﷺ বলেছিলেন, "আমি আগামিকাল বলব।" এই বাক্যে 'ইন-শা-আল্লাহ' না বলার কারণে ১৫ দিন ওহি নাজিল বন্ধ ছিল।

অত:পর আয়াত নাজিল হয়, "কখনও তুমি কোনো বিষয়েএ কথা বল না যে- আমি এটি আগামীকাল করব। ইনশাআল্লাহ কথাটি না বলে। যদি (কথাটি বলতে) ভুলে যাও, তাহলে (যখনই তোমার মনে আসবে) তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর ও বল- সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।"[৩০]

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, "যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ, যদি হজরত সুলাইমান ﷺ ঐ সময় 'ইন-শা-আল্লাহ' বলতেন তার মনোবাসনা পূর্ণ হত এবং তার প্রয়োজনও পুরো হয়ে যেতে, তার ঐসব সন্তান যুবক হয়ে আল্লাহর পথে মুজাহিদ হয়ে যেত।"[৩১]

'নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুনতাখাবুন নাফায়িস' এ সুলাইমান ﷺর অন্য একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে যে, সুলাইমান ﷺ একদিনের জন্য সমস্ত সৃষ্টিজীবের খানার ইন্তেজাম করার অনুমতি আল্লাহ তাআলা থেকে গ্রহণ করেন। কিন্তু আল্লাহ তাকে এটি তার জন্য অসম্ভব বললে তিনি 'ইন-শা-আল্লাহ' বলা ব্যতীত বললেন, তিনি তা করতে সক্ষম। তারপর সমস্ত সৃষ্টিজীবের জন্য তিনি প্রচুর খাবার একত্রিত করেন। কিন্তু তা একটি সামুদ্রিক মাছ এসে এক লোকমায় খেয়ে ফেলল। খাবার পর সেই মাছ বলল, "হে আল্লাহর নবি! আমিতো ক্ষুধার্ত!" তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, "তোমার প্রতিদিনকার খাবার কি এর চেয়ে বেশি?" মাছ বলল, "এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি, আমি প্রতিদিন সত্তর হাজার মাছ খাই।" সুলাইমান ﷺ'র এ ঘটনার ব্যাখ্যায় 'ইন-শা-আল্লাহ' না বলার পরিণাম উল্লেখিত হয়েছে।

এভাবে আল্লাহ তাআলা নবিদের জীবনের ঘটনাবলী আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হিশেবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন। যেখানে সমগ্র নবিদের সর্দার স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ-র প্রতি 'ইন-শা-আল্লাহ' না বলার দরুণ ওহি নাযিলে দেরি হয়েছে সেখানে আমরা তার উম্মত হয়ে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কতশত কাজের আশ্বাস মানুষকে দিয়ে রাখি 'ইন-শা-আল্লাহ' বলা ছাড়াই। অথচ, আল্লাহর ইচ্ছা-ই চূড়ান্ত। তিনি না চাইলে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুত কাজকে বিন্দুমাত্র বাস্তবায়িত করতে পারবনা। তাই

৩০. আল-কাহফ, আয়াত: ২৪-২৩

৩১. বুখারি: ৩৪২৪, ৫২৪২, ৬৬৩৯, ৭৪৬৯, মুসলিম: ১৬৫৪

আমরা কোন কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা হবে রবের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলবো, 'ইন-শা-আল্লাহ'। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা তা কারো জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারব কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মুমিনের উচিত মনে মনে সাথে মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা, "যদি আল্লাহ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামী কাল করব।"

মুনাফিক সর্দার এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ

মারিহা জান্নাত ইসলাম তানহা

উহুদ-যুদ্ধে ১০০০ সৈন্যের বিরাট মুসলিম বাহিনী গঠন করা হয়। প্রতিপক্ষ ছিল আরো বড়। ৩০০০ কুরাইশ সৈন্য। মুসলিম বাহিনী যেমন দেখার মত, তেমনই দেখার মত তাদের সেনাপতি। হায়, 'সেনাপতি' উপাধিও যেন সেদিন ধন্য হয়েছিল। সেদিন প্রথমবারের মত এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ। বিশাল বহর, বুকে এক আল্লাহর বিশ্বাস নিয়ে বীর দর্পে এগিয়ে যাচ্ছিলে মুসলিম বাহিনী। কিছুদূর যেতেই দেখা দিল জটিল সমস্যা। দলের মধ্যে লেগে গেল দ্বন্দ্ব । কেউ বলছে যুদ্ধে যাবে, আবার কেউ বলছে যাবেনা। এই দ্বন্দ্বের স্রষ্টা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল নামক ব্যক্তি। খাজরাজ গোত্রের সর্দার সে। তার প্ররোচনায় বিশাল বাহিনী দুই ভাগ হয়ে গেল। ৩০০ জন সৈন্য ফিরে চলে আসল মদিনায়। বাকি রইলেন ৭০০ বীরযোদ্ধা। বিচলিত হননি একজনও। হবেনই বা কেন? তাদের ভরসাতো একমাত্র মুহাম্মদুর ﷺ। রসুলুল্লাহ ﷺ আছেন তো আল্লাহর সাহায্যও সাথে আছে। আর আল্লাহর সাহায্য যাদের সাথে আছে তাদের বুঝি আবার হতাশার কারণ থাকে! তাই সাহাবা আলাইহিমুর রিদুয়ান ছিলেন অটল, স্থির, দৃঢ়।

যুদ্ধে অনেক কিছুই ঘটে গেল। সাহাবা আলাইহিমুর রিদুয়ান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, হজরত আমির হামযাহ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু শহিদ হলেন, সবচেয়ে বড় কথা রসুলুল্লাহ ﷺ আহাত হলেন। বাকি ৩০০জন যুদ্ধের ময়দানে থাকলে কী হত তা জানা নেই। কিন্তু যুদ্ধের মাঝ পথে সঙ্গীদের বিপদের মুখে রেখে আসার কারণে ৩০০ জনকে না হলেও, চক্রান্ত করার দায়ে অন্তত, উবাই ইবনে সুলুলকে এক চরম শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ রসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিল। কিন্তু এত কিছু হারিয়েও তিনি ﷺ প্রতিশোধ বা শাস্তি দেওয়ার কথাও ভাবলেন না। নূন্যতম শাস্তিও দিলেন না। বরং, এমনিতেই মাফ করে দিলেন।

ক্ষমা পেয়েও শিক্ষা হল নাউবাই ইবনে সুলুল-এর। জারি রাখলো তার মুনাফিকি। বনু মুস্তালিক যুদ্ধের সময় আবার দেখিয়ে দেয় তার আসল রূপ। যুদ্ধ হতে মদিনায় ফেরার পথে রাত নেমে এসেছিল। রাতে বিশ্রামের নিমিত্তে রাসুলে পাক ﷺ তাবু ফেললেন এবং সবাইকে বিশ্রাম করার নির্দেশ দিলেন। পাশেই একটা কুপ ছিল। যা থেকে সবাই পানি সংগ্রহ করে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ, মুহাজির এবং আনসার সাহাবিদের মধ্যে পানি উত্তোলন নিয়ে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। যা এক পর্যায়ে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে আনসারদেরকে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে এবং কৌশলে রসুলে করিম ﷺ-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবার স্বপ্ন দেখতে লাগল উবাই ইবনে সুলুল। সে আনসারদেকে একটি স্থানে একত্রিত করল।একত্রিত করে সবার মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদান করল, "আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে, অবশ্যই যে অত্যন্ত সম্মানিত সে সেখান থেকে তাকেই বের করে দেবে, যে অত্যন্ত লাঞ্ছিত।" অর্থাৎ, মদিনাবাসীরা সম্ভ্রান্ত লোক আর রাসুলে পাক ﷺ সহ মুহাজিরগণ নিচু জাত (নাউজুবিল্লাহ)।

রসুলে পাক ﷺ পর্যন্ত এই খবর পৌঁছাতে মোটেও দেরি করলেন না হজরত যায়েদ বিন আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। এই কথা শোনা মাত্রই হজরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তরবারি বের করে উবাই ইবনে সুলুলকে হত্যার অনুমতি চেয়ে বসলেন। পাশেই বসা ছিলেন উবাই ইবনে সুলুল-এর আপন পূত্র, আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু। ওমর

রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু দাঁড়িয়ে যেতেই তিনিও নিজ পিতার এই চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য নিজ হাতে পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চেয়ে বসলেন। কিন্তু, আমার মুস্তফা জানে রহমত ﷺ অনুমতি দিলেন না। বরং, এইবারও এই মুনাফিককে মাফ করে দিলেন। ক্রোধান্বিত হওয়া তো দূরের কথা, উলটো আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শান্ত করতে লাগলেন। পিতার রক্তে নিজ হাত না রাঙানোর উপদেশ দিলেন। অতঃপর সুরা মুনাফিকুনের ৭ নং আয়াত নাযিল হয়। যেখানে যায়িদ বিন আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথার সত্যতা এবং উবাই ইবনে সুলুল-এর মুনাফিকি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হল। ইবনে সুলুলের মুনাফিকি এত সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও তাকে রাসুলে পাক ﷺ না নিজে, না কোন সাহাবি জনসম্মুখে 'মুনাফিক' বলে সম্বোধন করতেন। বরং তাঁরা বার বার তাকে ক্ষমা করেছেন। ছাড় দিয়েছেন।

ছাড় পেতে পেতে একসময় উবাই ইবনে সুলুল তার সীমা অতিক্রম করে বসে। সে শেষ পর্যন্ত আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর পবিত্রতম চরিত্রের ওপর মিথ্যা অবপাদ দিয়ে বসে। অপবাদ দেওয়ার মধ্যেও সে সীমাবদ্ধ ছিলনা। বাজারে গিয়ে গিয়ে সবাইকে বুঝাতে লাগল। এক এক করে সবাইকে ধরে ধরে বার বার আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর পবিত্র চরিত্র নিয়ে অপবাদ রটাতে লাগল। কথা এতদূর গড়িয়েছিল যে, মিম্বারে দাঁড়িয়ে আমার মুস্তাফা ﷺ বললেন, "হে মুসলিম জাতি, কে আমাকে সাহায্য করবে এমন লোকের বিরুদ্ধে, যে কষ্ট দিতে দিতে এবার আমার পরিবার নিয়েও আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে?" দীর্ঘ ঝড়-ঝাপটা এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিক্ষা নেওয়ার পরে, আল্লাহ তায়ালা এই লা'নতি ব্যক্তির সবধরণের নোংরা কথা থেকে আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে পবিত্র ঘোষণা দিয়ে 'সুরা নুর' শরিফের দশটি আয়াতে করিমা নাযিল করেন।

এতসব কিছুর পর, এত কষ্ট সহ্যের পর, এত সুস্পষ্ট ঘোষণার পরেও রসুলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনে সুলুলকে কিছুই করেননি। এইবারও ছেড়ে দিলেন।

এখানেই শেষ না। ইনি যে মুস্তফা জানে রহমত রসুল ﷺ। উবাই ইবনে সুলুল-এর মৃত্যুর পর হজরত আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুরসুলে করিম ﷺ-এর কাছে ছুটে এসে অনুরোধ করে বললেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ, আমার বাবার কাফনের জন্য আপনার জামা মুবারকটি প্রদান করুন, তাঁর জানাযায় শরিক হয়ে তাঁর জন্য দুয়া করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" এটি ছিল ছেলের পক্ষ থেকে বাবাকে বাঁচানোর এক সরল এবং পবিত্র প্রচেষ্ঠা। রসুলুল্লাহ ﷺ তাই করলেন। এই মুনাফিকের মৃত্যুর পর রসুলে পাক ﷺ ইবনে সুলুল-এর কাফনের কাপড়ের জন্য নিজের জামা মুবারকও দিয়েছিলেন এবং জানাযাও পড়েছিলেন। (বুখারি শরিফ- (১২৬৯

যদিও একটু সময় পরে 'সুরা তাওবার' ৮৪নং আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকের জানাযায় অংশ গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেন। কিন্তু, এটাই মুস্তফা করিম ﷺ। তাই তো নজরুল বলছে,

"তোরে মারল ছুঁড়ে জীবন জুড়ে ইট পাথর যারা,
সেই পাথর দিয়ে তোলরে গড়ে প্রেমেরই মসজিদ।"

নবি-নন্দিনী

সালমন সালমা

অভ্যাস, তাই রাত জাগি। বদঅভ্যাসও বলতে পারেন। পেঁচার মত জেগে থাকি। বই পড়ি, লেখালিখি করি, সিনেমা দেখি। এরপর ঘুমিয়ে গেলেও উঠে নামায পড়ি, আর না হয় একেবারে নামায পড়েই ঘুমাই। আমি দুইটা সময় ফোন রিসিভ করিনা। প্রথমতো ঘুমের সময়, দ্বিতীয় গাড়িতে থাকলে। সকাল ৮ টায় ফোন বেজে উঠল। যথারীতি ফোন তুললাম না কিন্তু অবাধ্য ফোন বেজেই চলল। চোখ কচলে ফোন তুলে দেখলাম শম্পার কল। রিসিভ করতেই কেটে গেল। শম্পা আমার বান্ধবী। খুব ভাল বান্ধবী। বিয়ে হয়েছে প্রায় দেড় বছর। জামাই বাড়ি থেকে যখন কোন মেয়ে কল দেয়, তখন সেটাকে অতটা লাইটলি নেওয়া যায় না। আমিও নিলাম না। দিলাম কল।

-কিরে কেমন আছিস? কখন থেকে ফোন করছি! সালাম-কালামের বালায় নাই। সোজা কথা। তাও অনেকটা বিচলিত কণ্ঠে। চিন্তা এখন দুশ্চিন্তায় পরিণত হল। সহজ গলায় বললা, "গতকাল রাত করে ঘুমিয়েছি, তাই। কেন রে? এত সকাল সকাল কল দিলি, কিছু হয়েছে নাকি?" শম্পা গলা নিচু করে জবাব দিল, "বলিস নারে বোন, খুব অশান্তিতে আর ঝামেলায় আছি।"

আমি আরো ঘাবড়ে গেলাম। কিছু একটা বলার আগেই শম্পা আবার কথা শুরু করল-

গতমাসের ১৩ তারিখ ছিল আমাদের বিবাহবার্ষিকী। বছরে মাত্র একটা দিন তাও সে কিনা তারিখটা ভুলে গেল।আমিও আর মনে করিয়ে দেই নি।আফিস থেকে এসেও তার স্মরণ হল না দেখে খুব রাগ হল। অপেক্ষা করছিলাম ঘরে আসার। ঘরে আসতেই আচ্ছামত রাগ ঝেড়ে নিলাম। যদিও একটু বেশিই করে ফেলেছিলাম। তারপর দুজনেই না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।
ফোনের ওপাশে থেকে রীতিমতো হতাশ আমি। ভাবতে লাগলাম এটাও বুঝি অভিযোগ হতে পারে! থাক, এত ভেবে লাভ নেই। জানতে চাইলাম এখন সব ঠিকঠাক আছে কিনা?
শম্পা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কি আর ঠিকঠাক। কোনোরকম বেঁচে আছি আরকি। রোজ কোন না কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া বেঁধেই যায়। বাঁধবে নাই বা কেন বল? রাতুল আমার কোনো চাহিদাই পূরন করছে না।"

শম্পার স্বামীর নাম রাতুল। "চাহিদা পূরণ করছেনা" কথাটা শুনতেই আমি অন্যমনষ্ক হয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম, বিয়ের পরপরই ওরা হানিমুনে গিয়েছিল দুবাই। সম্পূর্ণ শম্পার ইচ্ছেতে। তাই আমি হিশেব মিলিয়ে নিচ্ছিলাম যে, যেই মানুষ বউয়ের ইচ্ছা মত দুবাই নিয়ে গিয়ে হানিমুন করে আসে, সে আবার কোন চাহিদা পূরণ করেছেনা। অতি কৌতুহলী হয় শম্পাকে জিঙ্গেস করলাম, "কী এমন চাহিদা তোর, যা রাতুল ভাই পূরণ করল না?

শম্পা বলল, "নতুন কালেকশনের কিছু শাড়ি চেয়েছি, অমনি মুখের ওপর বলে দিল, সে নাকি পারবেনা। আমি কি বেশি কিছু চাই নাকি? সামান্য এই আবদারটুকুও সে রাখল না আমার। খুব আফসোস হল। বসে বসে ভাবি এটা কি সেই রাতুল যে আগে আমার সব ইচ্ছা পূরণ করত!"

কথাগুলো শুনে ফোনেই বেশ বড় ঢেকুর তুললাম। ভাবতে লাগলাম, কি অদ্ভুত মেয়ে, শাড়ি নিয়ে দিল না বলেই, কত অভিযোগ দাঁড় করিয়ে দিল! আমার জানামতে রাতুল ভাই খুব পরিশ্রমী মানুষ।

সকাল ৮টায় বের হয়, ফিরে রাত ৯টায়। অন্যের খবরদারিতে চাকরি করে। আফিসে নানাবিধ মানসিক চাপ। ঘরে এসেও তার এখন শান্তি হয় না। রাতুল ভাই কখনই শম্পার কোন ইচ্ছা অপূরণ রাখেনি, আজ যতসামান্য কটা শাড়ি না দেয়াতে পূর্বের সবকিছুই শম্পা কি করে ভুলে গেলো!

এতক্ষণের সব কথা শুনে মাথা একেবারে তাওয়ার মত তেঁতে উঠেছে। একেতো সকাল সকালের স্বর্গীয় ঘুম থেকে বঞ্চিত করল, তারপর আবার শোনাচ্ছে তার যত্তসব ন্যাকামি কথা-বার্তা। তবুও বান্ধবি কষ্টে আছে ভেবে কিছুই বললাম না। খানিকটা বিরক্তির স্বরেই জিজ্ঞাস করলাম, "আর কি কিছু বলবি? "

"না, থাক। তোকে ডিস্টার্ব করলাম। রাখছি।" বলে ফোনটা কেটে দিল। শম্পা বুঝেছে যে, তার কথাগুলো আমার কোন মনে কোন দরদ জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই প্রথাটা আমাকে প্রচণ্ড রাগান্বিত করে। ডিস্টার্ব হব, এটা যখন এতই জানা ছিল তখন এই সাদসকালে কলটা দিলিই বা কেন? ধুর ছাই! আমিও ফোনটা রেখে দিলাম।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু মস্তিষ্ক বন্ধ হল না। ভাবতে লাগলাম শম্পার কথা। কুরআনে পাকের একটি আয়াত মনে পড়ল। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, **"তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাঁদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন।"**[৩২] একজন স্বামীকে যথাযথ মানসিক ভাবে সাপোর্ট দেয়া একজন স্ত্রীর কর্তব্য। রাতুল ভাই আসলে চায় কী? সারাদিন অন্যের খাটুনি খেটে এসে বাড়ি ফিরে একটি প্রশান্তির হাসি দেখতে চায়। অফিসের কষ্টের মুহূর্তগুলো শেয়ার করে কিছুটা হালকা হতে চায় হয়তো।যা তার সারাদিনের অমানসিক খাটনিকে মুহূর্তে দূর করে দিবে। রাতের ঘুম ভালো করে দিবে। মন-মেজাজ ফুরফুরে করে দিবে।

পৃথিবীর সব চাহিদা পূরণে সবাই সক্ষম হয় না। একজন স্ত্রীর মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হয়। এটাতো একটা কমনসেন্সের ব্যপার যে, যেই মানুষ গত কয়েক বছর ধরে আমার সব আবদার পূরণ করে গেল, আমাকে খুশি রাখল, আজ সামান্য কটা শাড়ীর জন্য আমি তার সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ কীভাবে করবো! এটা মনুষ্যত্ব নয়। শম্পার আরো সংবেদনশীল হতে হবে। হতে হবে আরো বিনয়ী।

আসলে নারীদের উত্তম চরিত্রের জন্য একটি আশ্রয়স্থল থাকা উচিত। যার কাছে গিয়ে একজন নারী তার চলার প্রতিটি কদম-কদমের শিক্ষা নিতে পারবে। পৃথিবীর বুকে এমন আশ্রয়স্থল কেবল একটিই পাওয়া যায়। তিনি হলেন- নন্দিনী, সুন্দরী, স্বচ্ছ, শুভ্রা, নির্মল, পবিত্রা এবং বিস্ময়ী এক নারী। তিনিই হলেন- 'সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিনতে রসূল ﷺ।'

হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হুযুর ﷺ এরশাদ করেন,

"তোমরা চলার সময় সূর্যের আলোকে অনুসরণ করে চল, আর সূর্য অস্ত গেলে রাত্রি বেলায় চন্দ্রের আলোকে অনুসরন করে চল, আর চন্দ্র অস্ত গেলে শুকতারাকে অনুসরণ করে চল। আর শুকতারা অস্ত গেলে দুই ফরক্বদ, তথা পূর্ব ও পশ্চিমের দুইটি তারাকে অনুসরণ কর। অতঃপর, হুযুর ﷺ বলেন, সুর্য হলাম- আমি (নবুয়তের), আর চন্দ্র হল- হজরত আলী (বেলায়তের) আর শুকতারা হল- হজরত ফাতেমাতুয যাহরা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহা, আর দুই ফরক্বদ হচ্ছে ইমাম হাসান রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু ও ইমাম হোসাইন রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু।"

---

৩২. সুরা রূম-২১

হাদিসে পাকে শুকতারার অনুসরণের মর্মার্থ হল, হজরত সাইয়্যিদা ফাতিমারাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু এর আর্দশের পথে ও মতে জীবন পরিচালিত করা। তিনিই অনুসরণীয় আর্দশ।

হজরত মা ফাতেমা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু সারা জাহানের নারীদের একমাত্র পথ-প্রদর্শক। আর যে কেউ তাঁকে অনুসরণ করবে, সে জানতে পারবে যে, সাইয়্যিদা ফাতেমা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু সবসময় হজরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু-এর দুঃখ-কষ্টের ভাগী হতেন। দোষ অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকতেন। মনে কষ্ট পায় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকতেন। হজরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু-এর সাধ্যের বাইরে কোন কিছুই চাইতেন না। অপ্রয়োজনীয় আবদার করে হজরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু কে কষ্ট দিতেন না। কখনোই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ করতেন না।

ভাবলাম কোথায় নবি-নন্দিনী, জান্নাতের সর্দারনী সাইয়্যেদা ফাতেমা বাতুল রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু-এর সুমহান চরিত্র, আর কোথায় আমাদের আজকালের লাইফস্টাইল। কোথায় তাঁর জাতে পাক থেকে আমরা ধৈর্য, শোকর এগুলোর শিক্ষা নিব। অথচ আমরা কিনা আছি, কিছু শাড়ি না পাওয়ার শোকে স্বামীর সাথে ঝগড়া করার মানসিকতায়।

কতই না পবিত্র, স্বচ্ছ তাঁর জীবন! তাঁর চরিত্রের অনুসরণ কতটাই না আলোয়-আলোকিত। অথচ আমরা, কখনো স্বাধীনতা, আবার কখনো আধুনিকতার নামে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছি গভীর আঁধারে। কাজী নজরুল ইসলাম কত সুন্দর করেই না বলেছিলেন-

“সাহারার বুক এ মাগো তুমি মেঘ-মায়া,
তপ্ত মরুর প্রাণে স্নেহ-তরুছায়া;
মুক্তি লভিল মাগো তব শুভ পরশে বিশ্বের যত নারী বন্দিনী।
খাতুনে জান্নাতা ফাতেমা জননী- বিশ্ব দুলালী নবি নন্দিনী,
মদিনাবাসিনী পাপতাপ নাশিনী উম্মত-তারিণী আনন্দিনী।”

(নজরুল রচনাবলি, দশম খণ্ড , ২২৯ পৃষ্ঠা।)

সিদ্দিকাহ ﵂'র দৃঢ়তা

তাহসিন জান্নাত তাবাসসুম

ঘটনা ইফক-এর। মুমিন-জননী, সিদ্দিক-নন্দিনী, সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দিকা ﵂-এর পবিত্রতা নিয়ে অপবাদ রটে গেল। জঘন্যতম এই কুৎসা রটনায় প্রধান ছিল রাঈসুল মুনাফিকিন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল (লা'নাতুল্লাহি আলাইহি)। রটানো হল বাজারে, পৌঁছে গেল সবার ঘরে ঘরে। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ বা এমনিতেই বলল। মুখ থেকে কানে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল হাবিবে খোদা ﷺ-এর কাছে। তিনিতো বিশ্বাস করলেন না একবিন্দু। কিন্তু ঘটনা তো রটেছে। নিজ মুখে প্রতিবাদ করলে হয়তো কেউ বলবে, কোন প্রমাণ ছাড়াই দেখ স্বামী হয়ে স্ত্রীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। অপেক্ষা করতে লাগলেন ওহি আসার। ঘটনার বাস্তবতা সম্বন্ধে তদন্ত করতে লাগলেন। সিদ্দিকাহ ﵂ তখন অসুস্থ। অসুস্থতা প্রায় এক মাস। তিনি এইসবের কিছুই জানতেন না। তবে, কিছুদিন ধরে রসুল ﷺ'র ভালবাসা, স্নেহ-যত্নে কমতি বরাবরি অনুভব করছিলেন।

একরাতে উম্মে মিসতাহ-এর সাথে ঘুরতে বের হলে জানতে পারলেন সকল ঘটনা। শুনে আবক বনে রইলে সিদ্দিকাহ ﵂। অস্থির হয়ে পড়লেন। নারীরা সব সহ্য করে, কিন্তু চরিত্রে অপবাদ কখনো না। রাগ তখন একেবারে তুঙ্গে। ছুটে গেলেন নবিজি ﷺ-এর কাছে। বিচক্ষণ সিদ্দিকাহ ﵂। রসুল ﷺ কে কোন কিছুই জানালেন না। বুঝতেও দিলেন না। পাছে কিছু ভুল না করে বসেন। অনুমতি চাইলেন বাবার ঘরে যাওয়ার। অনুমতি পেতেই ছুটে গেলেন বাবা-মায়ের কাছে।

মায়ের কাছে ঘটনার বাস্তবতা জানতে পেরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। সিদ্দিকাহ ﵂-এর পবিত্রতার ওপর আজ সবার প্রশ্ন। স্বয়ং প্রিয়তম রাসুল ﷺ হয়তো তাঁকে বিশ্বাস করছেন না। এগুলো ভাবতে ভাবতে সারা রাত কেঁদে কাটালেন।

এদিকে মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র পরামর্শে রসুলে খোদা ﷺ তদন্তে লেগে গেলেন। দাসি থেকে বান্ধবি সবার থেকে জিজ্ঞাস করলেন। যেই যয়নাব ﵂ সবসময় সিদ্দিকাহ ﵂ এর সাথে প্রতিযোগিতায় থাকতেন স্বয়ং তিনিও সিদ্দিকা ﵂ এর পবিত্রতায় পঞ্চমুখ। সাইয়্যিদা যায়নাব ﵂ বললেন, "আমি আমার কান ও চোখ পর্যবেক্ষণ করেই চলি। আল্লাহ'র কসম, আমি তার মাঝে কেবল কল্যাণই দেখেছি।" সবদিকে সাইয়্যিদা সিদ্দিকাহ ﵂-এর পবিত্রতা শুনলেন। এবং নিজের হৃদয়ের কথাকেও প্রাধান্য দিলেন। ব্যথিত হৃদয়ে দাঁড়ালেন মিম্বারে। উবাই ইবনে সুলুলের ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরে সাহাবা আলাইহিমুর রিদুয়ান-দের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে মুসলিম উম্মাহ, কে আছ আমাকে সাহায্য করবে, ওই লোকের কাছ থেকে যে আমাকে কষ্ট দিতে দিতে এখন আমার পরিবারের বিষয়েও আমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আল্লাহ'র কসম, আমার স্ত্রীর ময়াঝে ভাল বৈ মন্দ কিছু পাইনি আমি। তারা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে কথা রটিয়েছে, যাকে আমি উত্তম বলেই জানি। সে আমার সঙ্গ ব্যতীত আমার ঘরে আসেনি কখনো।"

এভাবে কেটে গেল একমাস। এই ঘটনার কোন মীমাংসা হল না। আল্লাহ'র পক্ষ থেকেও কোন জবাব আসল না। এদিকে সাইয়্যিদাহ সিদ্দিকাহ ﵂ এখনো বাবার ঘরেই। একদিন হাবিবে খোদা ﷺ আসলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু ঘরে। অনুমতি চেয়ে প্রবেশ করলেন সাইয়্যিদাহ সিদ্দিকাহ ﵂-এর কক্ষে। আজ একমাস পর, দীর্ঘ একমাস পর প্রিয়তম স্ত্রীর পাশে বসলেন হাবিবে খোদা ﷺ। শাহাদাহ পড়ে কথা শুরু করলেন। বললেন, "হে আয়েশা ﵂, তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে এই এই সংবাদ এসেছে। যদি তুমি নিষ্পাপ হুয়ে থাকো, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা ঘোষনা করবেন অচিরেই। আর

যদি তুমি কোন পাপ করেই থাকো, তবে আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর কাছে তাওবা করো। কোনো বান্দা গুনাহ করে আল্লাহ'র কাছে তা স্বীকার করে তাওবা করলে তিনি তাওবা কবুল করেন।"

হাবিবে খোদা ﷺ-র কথা শুনে অবাক বনে রইলেন সাইয়্যিদাহ সিদ্দিকাহ ﵂ এতক্ষণ দুই চোখ দিয়ে বেদনার যেই অশ্রু ঝরছিল তাও এখন বন্ধ হয়ে গেল। অধিক শোকে পাথর হয়তো একেই বলে। মাথায় রাগ চেপে বসল। মাথা নিচু হয়ে সব কথা শুনছিলেন তিনি। এখনো নিচুই আছে। এভাবেই আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "বাবা, আমার পক্ষ থেকে রসুল ﷺ-কে উত্তর দিয়ে দিন।" সাইয়্যিদাহ সিদ্দিকাহ ﵂ এর এমন আচরণে সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু অবাক। নিজ কন্যাকে শাসন করার ভাষাও নেই। রসুল ﷺকে বলার মত শব্দও নেই। অপারগতা প্রকাশ করলেন আবু বকররাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু। একই ভাবে মাকেও বলতেও বললেন। মাও দিলেন একই জবাব। ব্যথিত কণ্ঠে মুমিনদের মা, সাইয়্যিদা সিদ্দিকা ﵂ উত্তর দিলেন, "আল্লাহ'র কসম, আমি জানি, আপনারা এই ব্যাপারে যা শোনার শুনেছেন। সেটাই আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তাই আপনরা বিশ্বাস করে ফেলেছেন। এখন যদি আমি নিজেকে পবিত্র বলি (আর আল্লাহ জানেন আমি পবিত্র), তবে আপনাদের অন্তর তা মেনে নেবে না। কেননা, আপনারা অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়েছেন। আর যদি না করা পাপটি আমি স্বীকার করে নিই(আর আল্লাহ জানেন আমি পবিত্র), তবে আপনারা আমাকে মিথ্যার ব্যপারটিতে বিশ্বাস করে নেবেন। এই জন্য আমার ও আপনাদের জন্য সে-ই উদাহরণই যুৎসই, যা ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর পিতা তাঁর ভাইদের বলেছিলেন, "ধৈর্যধারণই উত্তম। আর তোমরা যা বলছ, তাঁর জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।"[৩৩]

এইগুলো বলে সাইয়্যিদাহ সিদ্দিকাহ ﵂ অন্যপাশে ফিরে শুয়ে পড়লেন। আবার চোখ দিয়ে অশ্রু-নদী বইতে লাগল। এমন সময় রসুলে খোদা ﷺ হঠাৎ কাঁপতে শুর করলেন। শীতের দিনেও ঘামতে লাগলেন। সবাই বুঝতে পারলেন তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সব স্বাভাবিক হল। রসুল ﷺ সাইয়্যিদাহ সিদ্দিকাহ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু-এর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। পবিত্র জুবানে মুখ হেসে বললেন, "হে আয়শা ﵂, সুসংবাদ নাও। আল্লাহ তোমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন।"

উপস্থিত সকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন। সাইয়্যিদাহ সিদ্দিকাহ ﵂ এর মা এসে তাকে রসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাতে এবং ক্ষমা চেয়ে আসতে বলেন। সাইয়্যিদাহ সিদ্দিকাহ ﵂ যদিও আনন্দ আত্মহারা, তবুও কিছুটা অভিমানী হয়ে জবাব দিলেন, "আল্লাহ'র শপথ, আমি তাঁর কাছে যাব না। আমি কেবল আল্লাহরই প্রশংসা করব। কেননা তিনিই আমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করলেন।" হাবিবে খোদা ﷺ বুঝতে পারলেন সাইয়্যেদাহ সিদ্দিকাহ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহা অভিমান। বুঝতে পেরেই সিদ্দিকাহ ﵂ এর দৃঢ়তাকে সম্মান জানালেন।

সাইয়্যিদাহ সিদ্দিকাহ ﵂'র বয়স ছিল অল্প। কিন্তু ইফক-এর ঘটনার প্রতিটি পরতে পরতে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বশেষ, দৃঢ়তার যেই দৃষ্টান্ত তিনি দেখালেন সেটা অতুলনীয়। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে একজন স্ত্রীর স্থান থেকে রসুল ﷺ-কে যা জবাব দিলেন তা আসলেই উপমাহীন। আল্লাহ তায়ালাও এই কঠিন পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সিদ্দিকাহ'র শানে ১০টি আয়াত নাযিল করে দিলেন। আর সবাইকে জানি দিয়েলন, আয়েশা যতটা সিদ্দিকাহ ঠিক ততটাই ত্বোহেরাহ।

---

৩৩. সুরা-ইউসুফ, ১৮

অনন্য তাওবাহ

সাইয়্যিদাহ ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ

২৫ রাত পর্যন্ত বনু কুরাইযা'র দূর্গ ঘেরাও করে রেখেছে মুসলিম বাহিনী। খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বিশ্রামের ফুরসতও পাননি তাজেদারে মদিনা ﷺ। মদিনায় এসে ঘরে ঢুকে হাতিয়ার রেখে গোসল করে বেরিয়ে আসতেই দেখলেন হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম হাজির। আলাইহিস সালাম হজরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বললেন, "আপনি হাতিয়ার রেখে দিলেন? কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমরা এখনো হাতিয়ার রাখিনি। আপনি তাঁদের দিকে মনোনিবেশ করুন।" এই কথা বলে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বনু করাইযা'র দিকে ইশারা করলেন(সহিহ বুখারি-২৮১৩)। প্রভুর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে কালবিলম্ব না করেই রওনা দিলেন বনু কুরাইযা'র দিকে। বনু কুরাইযা'র চুক্তি ভঙ্গের এবং বিরোধীদের সাথে মিলে রসুলুল্লাহ ﷺ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার চরমতম ধৃষ্টতার শিক্ষা তাদের এবার পেতেই হবে।

২৫ রাত মতান্তওে ১৫ কিংবা ১০ রাত ঘেরাও ছিল পুরো বনু করাইযা'র বিশাল দূর্গ। অবরুদ্ধ অবস্থায় বনু কুরাইযা'র খাবারের মজুদ শেষ হয়ে আসে। এখন তাদের সামনে বাস তিনটি পথ। হয় ক্ষমা চেয়ে ইসলাম'র ছায়া তলে প্রবেশ করবে, না হয় মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আর না হয় আত্মসমর্পন করবে। আর আত্মসমর্পন করলে তাদের হয়তো মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হবে। এই ভয়ে এবং কোন উপায়ন্তর না দেখে তারা অনুরোধ জানাল যে, সাহাবি হজরত আবু লুবাবাহ (রঃ)'কে যেন তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়। রসুলুল্লাহ ﷺ তাই করলেন। ইহুদিরা দূর্গের ভেতরে আবু লুবাবাহ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'কে দেখেই চমকে উঠল। দাঁড়িয়ে গিয়ে আবারল-বৃদ্ধ সবাই তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারা আবু লুবাবাহ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'কে জিজ্ঞাস করল, "আমরা কি মুহাম্মদ ﷺ'র আদেশ অনুযায়ী দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়ব?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ" এবং সাথে সাথে তাঁর গলার দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ, তোমাদেরকে কতল করা হবে।

কিছুক্ষণ পরেই আবু লুবাবাহ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু উপলব্ধি করলেন যে, তার এই ইশারা করা উচিত হয়নি। কেননা, হত্যা করা হবে না অন্য শাস্তি দেওয়া হবে তা একমাত্র রসুলুল্লাহ ﷺ নির্ধারণ করবেন। তিনি নবিজি ﷺ'র সাথে খেয়ানত করে ফেলেছেন এই কথা ভেবে ভীষণ লজ্জিত হলে। রসুলুল্লাহ ﷺ'র সামনে দাঁড়ানোর সাহস পেলেন না। এক দৌঁড়ে তিনি মসজিদে নববি'র খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে নিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করে বলতে লাগলেন, "আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা না করা অব্দি তিনি এই বাঁধন খুলবেন না, বনু কুরাইযা'র দিকেও যাবেন না এবং এই শহরকেও কখন দেখবেন না।

বাতাসের বেগে এই খবর পৌঁছে গেল মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ﷺ'র কাছে। মসজিদের নববি'র খুঁটিতে আবু লুবাবাহ বেঁধে রেখেছে নিজেকে। রসুল ﷺ এই সংবাদ শুনে ইরশাদ করলেন, "সে যদি আমার কাছে আসত, তবে তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতাম(অর্থাৎ, সে ক্ষমা পেয়ে যেত)। কিন্তু এখন সে যা করেছে, আমি এই স্থান থেকে তাকে খুলবো না; যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা করবুল করবেন।"

তিনি সারাদিন এত বেশি কান্না করতেন যে, তাঁর দেখার এবং শোনার শক্তি চলে যাওয়ার উপক্রম হল। প্রতিদিন নামায এবং প্রাকৃতিক কাজের সময় তার স্ত্রী এই বাঁধন খুলে দিতেন। কাজের শেষে

আবার লাগিয়ে দিতেন। এভাবে দশ দিন থেকে বেশি সময় কেটে গেল। একদিন আম্মাজান উম্মে সালমা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহা'র হুজুরায় রসুল ﷺ আরাম ফরমাচ্ছিলেন। সাহারির সময় হঠাৎ আম্মাজান উম্মে সালমা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহা লক্ষ্য করলেন দয়াল নবিজি ﷺ হাসছেন। এই পবিত্র তাবাসসুম'র রহস্য জানতে চাইলে রসুল ﷺ উত্তর দিলেন, "আবু লুবাবাব'র তাওবা কবুল হয়েছে।" আম্মাজান উম্মে সালমা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহা আরয করলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ আমি কি তাকে এই সংবাদ দেব না? রসুলুল্লাহ ইরশাদ করলেন, "হ্যাঁ, যদি তুমি চাও।" তখন পর্দার বিধান নাযিল হয় নি। আম্মাজান উৎফুল্লতার সাথে ছুটে গেলেন হজরত আবু লুবাবাহ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র কাছে। জানালেন এই খুশির সংবাদ। কিছু হজরত আবু লুবাবাহ নিজেকে ছাড়ালেন না। তিনি বললেন, "শপথ করে বলছি, আমি খুলবোনা, যতক্ষণ না রসুলুল্লাহ ﷺ নিজ হাত মুবারকে খুলে আমাকে মুক্তি বে না।"

প্রিয় নবিজি ﷺ ফজরে নামায পড়াতে বের হলেন। শাফাআত'র সেই পবিত্রতম হাত মুবারক দিয়ে হজরত আবু লুবাবাহ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র বাঁধন খুলে দিলেন। সুরা তাওবা'র ১০২ নং আয়াতে পাকটিতে এই সময় নাযিল হয়। যেখানে রব্বুল ইজ্জত বলছেন, "অপর কতেক লোক রয়েছে, যারা নিজেদের গুনাহ সমূহ স্বীকার করেছে। (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, ৪৭৯-৪৮২ পৃষ্ঠা)।"

পূণ্যবতী কতিপয় রমণী

সাদিয়া আক্তার

হযরত শিবলী (রঃ) বলেন, 'আল্লাহর মহব্বতে যারা বিভোর, তারা আল্লাহ প্রেমের শরাব পান করেছে; ফলে তাদের জন্য পার্থিব জগত ও তদবিষয়াদি সংকুচিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর যথার্থ পরিচয় লাভে সক্ষম হয়েছে বলেই আল্লাহতে সমর্পিত হতে পরেছে। তারা আল্লাহ প্রেমে বিভোর। কেবল তাঁরই আরাধনায় , ইবাদত বন্দেগীতে নিবেদিত প্রাণ। তারা তাঁর সান্নিধ্যে মুনাজাত ও প্রেম নিবেদনের আস্বাদে আত্মহারা হয়েছে।' এমন-ই কতিপয় পূণ্যবতী রমনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো:

রাবিয়া আল আদাভিয়্যাহ

রাবিয়া বসরার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন আতিক গোত্রের মাওলা। সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ রাবিয়ার কাছে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে প্রশ্ন করতেন এবং এ বিষয়ে তাঁর ওপর আস্থা রাখতেন। তিনি রাবিয়ার উপদেশও দুআর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। রাবিয়ার প্রজ্ঞাপূর্ণ বিভিন্ন বাণী পরবর্তীতে সুফিয়ান সাওরি এবং আবু বিসতাম শুবা বর্ণনা করেছেন। জাফর ইবনে সুলাইমান বলেন, একবার সুফিয়ান সাওরি আমার হাত ধরে বলেন, 'আমাকে সেই শিক্ষিকার কাছে নিয়ে চল, যার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আমি আর স্বস্তি পাই না।' তাঁর কাছে আসার পর সুফিয়ান হাত উঠিয়ে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনার কাছে নিরাপত্তা চাই।' এ দুআ শুনে রাবিয়া কেঁদে ফেললেন। সুফিয়ান বললেন,'কাঁদছেন কেন?' 'আপনিই তো আমাকে কাঁদালেন! "কীভাবে?" আপনি কি জানেন না যে, দুনিয়া থেকে নিরাপত্তার অর্থ এর সবকিছু ত্যাগ করা? দুনিয়ার সাথে এমন মিশে থেকেও কীভাবে নিরাপত্তা পাবেন? 'শাইবান আল উবুল্লি বলেন, আমি রাবিয়াকে বলতে শুনেছি, প্রতিটি জিনিসেরই একটি ফলাফল রয়েছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফল হলো আল্লাহর অভিমুখী হওয়া।' একবার রাবিয়ার সামনে সালিহ আল মুররি বললেন,'যে বেশি বেশি করাঘাত করে,তার জন্য দরজা খুলে যায়। রাবিয়া বলে উঠলেন,

'দরজা তো খোলাই আছে। কথা হলো কার ঢোকার আগ্রহ আছে।'

আমাতুল্লা আল জাবালিয়্যাহ

আমাতুল্লাহ দামাগানের পাহাড়ি অঞ্চলে নাওকাবায নামের এক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন আবু আব্দলাহ আল জাবালির স্ত্রী। আবু আব্দুল্লাহ ছিলেন আবু ইয়াযিদ বেসতামির মুরিদ। আমাতুল্লাহর অনেক আধ্যাত্মিক নিদর্শন ও কারামত ছিল। তিনি প্রখর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তাঁর গ্রাম ছিল বেসতাম থেকে এক ফরসখ দূরে অবস্থিত। আমাতুল্লাহ সবসময় তার স্বামীকে আবু ইয়াযিদ ও তাঁর কাজকর্ম অবহিত করতেন। বলতেন,আবু ইয়াযিদ এই মুহূর্তে এটা করছেন। একদিন আবু আব্দুল্লাহ আবু ইয়াযিদ বেসতামির কাছে গিয়ে তার স্ত্রীর কথা বললেন। তিনি তখন চেয়ারে বসে অজু করছিলেন। তিনি একটি সাদা চাদর ভিজিয়ে চেয়ারের ওপর বিছিয়ে দিলেন। বললেন,'তোমার স্ত্রীকে বলবে সে সত্যবাদী হলে যেন চেয়ারের ওপর কী আছে বলে।' এরপর আবু আবদুল্লাহ বের হতেই তিনি চাদরটি উঠিয়ে নিলেন। বাসায় এসে আবু আব্দুল্লাহ স্ত্রীকে চেয়ারের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'চেয়ারে তো কিছুই নেই।' তখন আবু আব্দুল্লাহ বললেন, 'এখন বুঝতে পারলাম আমার স্ত্রী মিথ্যুক।' আবু ইয়াযিদের এমন করার কারন ছিল আমাতুল্লাহর এমন আধ্যাত্মিক মর্যাদা তার স্বামীর কাছে গোপন রাখা। আবু ইমরান বলেছেন, আমি আবু ইয়াযিদ বেসতামিকে বলতে শুনেছি, 'আমার লক্ষ ছিল আবু আব্দুল্লাহ। কিন্তু এটা প্রকাশ পেয়েছে তার স্ত্রীর মধ্যে।' এই মহীয়সী নারী তার স্বামী আবু আব্দুল্লাহকে বলেছিলেন,'আগামীকাল যদি তোমার

প্রভু বলেন- আমার কাছে কী নিয়ে এসেছ? তখন কী বলবে?' তিনি বললেন, 'এই রুটির জন্য আমরা কেবল আপনার ওপরই নির্ভর করতাম। 'তখন আমাতুল্লাহ জবাব দিলেন, 'আমি আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করি যে তার প্রশ্নের জবাব রুটি দিয়ে দেব।'

দরুদ প্রেমী এক বালিকা

একদিন শায়খুদ্দালায়েল ইমাম জাযূলী (রঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে যোহরের ওয়াক্ত হওয়ায় ওযু করার জন্য একটি কূপের নিকট উপস্থিত হলেন; কিন্তু পানি উঠানোর জন্য কোন পাত্র বা রশি খুজে পেলেন না। তিনি ইতস্ততা করছেন, এমন সময় পার্শ্বস্থ ঘরের জানালা হতে আট নয় বৎসরের একজন বালিকা তাকে জিজ্ঞেস করল-"আপনি কে, কি খোঁজ করছেন?" শায়খুদ্দালায়েল জবাব দিলেন, "মা আমি ইমাম জাযূলী পানি উঠানোর জন্য রশি খুজছি।" বালিকা হেসে বলল, "আপনি এত বড় ওয়ালী, "আপনার এত নাম শুনলাম! আর আজ আপনি এখানে রশির অভাবে পানি উঠাতে পারছেন না?" এই বলে বালিকা কূপের মধ্যে থুথু নিক্ষেপ করল। অমনি পানি উথলে উঠে কূপের কানায় কানায় ভরে গেল। শায়খুদ্দালায়েল ওযু করে বালিকাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মা খোদার কসম! বলতো কি কাজ করে তুমি এই বুযুর্গী লাভ করলে?" বালিকা উত্তর করল, "দরুদ শরীফ পড়ার বরকত।" বালিকার কথায় উৎসাহিত হয়ে শায়খুদ্দালায়েল ইমাম জাযূলী (রহ.) দরুদ শরীফ লিখে জমা করতে লাগলেন। ঐ দরুদ-সমাবেশের নামই সুপ্রসিদ্ধ 'দালায়েলুল খায়রাত'। বালিকার পঠিত দরুদটির নাম 'সালাতুল বীরা'। দরুদ শরীফটি এই-

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً دَائِمَةً مَقْبُوْلَةً تُوَدِّىْ بِهَا عَنْ حَقِّهِ الْعَظِيْم.

বারো মাস রোজা রাখা নারী

হযরত আবু আমের ওয়ায়েজ [রাহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আমি দাস কিনে বিক্রয়ের বাজারে এক দাসীকে দেখি,যে সামান্য দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিলো। তার পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে। মাথার চুল উস্কো খুস্কো হয়ে আছে। শরীরের রঙ ফ্যাকাসে। আমি দয়ার্দ্র হয়ে তাকে কিনে বললাম,আমার সাথে বাজারে চলো, রমজানের জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে। সে বললো, সেই আল্লাহর শোকর,যিনি আমার জন্য পুরো মাস একসমান করে দিয়েছেন,পৃথিবীর কোনো ব্যস্ততা আমার কাজকামে ব্যাঘাত করতে পারে না। সে দিনে রোজা রাখতো আর সারারাত নামাজ পড়তো। ঈদ ঘনিয়ে এলে আমি তাকে বললাম, দ্রুত আমার সাথে বাজারে চলো,কিছু কেনাকাটা করতে হবে। সে বললো, মনিব ! আপনি দুনিয়া নিয়ে অনেক ব্যস্ত। তারপর সে বাড়ির ভেতর গিয়ে নামাজে মন দিলো। সে ধীরস্থিরভাবে কোরআন তেলাওয়াত করছিলো। পড়তে পড়তে যখন- জাহান্নামিদেরকে পঁচা পুঁজ পান করানো হবে।" এ আয়াতটি বার বার তেলাওয়াত করতে করতে হঠাৎ চিৎকার করে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলো।

জঙ্গলে ইবাদতে মগ্ন বুড়ি

এক শায়েখ বলেন, আমি আর আবু আলি বদবি দুজনে এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে জঙ্গলের পথ ধরলাম। আমরা কয়েকদিন ধরে জঙ্গলে কাটানোর মাঝে একদিন একটি ঝোঁপ দেখে সেটির কাছে গিয়ে দেখি একবুড়ি বসে আছে। তার সাথে দরকারি কোনো বস্তুই চোখে পড়লো না। তার পাশে বড় একটি পাথর ছিল, যেটির মুখে ছোট একটি গর্তও ছিল। আমরা সালাম দিয়ে তার পাশে বসলাম।তিনি তখন নিজের ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। সূর্য অস্ত গেলে তিনি ঝোঁপের ভেতর মাগরিব নামাজ পড়ে বাইরে বের হলেন। তার হাতে দুটু রুটি আর খেজুর ছিল। তিনি আমাদেরকে বললেন,তোমরা ঝোঁপের ভেতর থেকে নিজ নিজ অংশ নিয়ে নাও। আমরা ভেতরে ঢুকে দেখি একটি পাত্রে চারটি রুটি আর কিছু খেজুর রাখা আছে। অথ এই জঙ্গলে অনেক খেজুর গাছ ছিল; কিন্তু কোনো গাছে খেজুর ছিল না। আমরা রুটি ও খেজুর খেয়ে

নিলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের ওপরে একখন্ড মেঘ ভেসে এসে ঠিক ঐ পাথরের গর্তটি বর্ষণের সাহায্যে ভরে দিলো, বাইরে একফোঁটা পানিও পড়ল না। আমি জানতে চাইলাম, তুমি এখানে কতদিন ধরে আছো? সে উত্তরে বললো,সত্তর বছর ধরে আল্লাহ আমাকে এভাবে রেখেছেন। তোমরা যেমন দেখলে,খাবার আর পানি এভাবেই আমাকে দিচ্ছেন। শীত কিংবা গরম যেকোনো মৌসুমেই এভাবে মেঘের সাহায্যে পানি আসে।এবার বুড়ি আমাদের গন্তব্য জানতে চাইলে বললাম, আমরা আবু নসর সমরকান্দির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। বুড়ি বললো,আবু নসর খুব ভালো মানুষ। তারপর হঠাৎ কাকে যেন বললো, এসো এই লোকদের সাথে দেখা করে যাও। সাথে সাথে আবু নসর আমাদের সামনে এসে দাড়ালো। আমরা পরস্পরের সাথে সালাম বিনিময় করলাম। আবু নসর আমাদেরকে বললেন,বান্দা যখন সব কাজে আল্লাহর আনুগত্য পোষণ করে, আল্লাহও তার যেকোনো ইচ্ছে পুরো করেন।

আয়েশা বিনতে আবু উসমান সাঈদ ইবন ইসমা'ঈল আল হিরি আন্ নিশাপুরি

শায়খ আবু উসমান আল হিরির সন্তানদের মধ্যে দুনিয়াবিরাগ ও পরহেজগারির ক্ষেত্রে আয়েশা ছিলেন সবার অগ্রণী। তাঁর দুআ কবুল করা হতে। তাঁর মেয়ে আহমদ বিনতে আয়েশা বলেন, আমার মা আমাকে বলেছেন, "বাছা, নশ্বর বস্তুর জন্য চিন্তিত হয়ো না। আনন্দিত হও আল্লাহকে নিয়ে, চিন্তিত হও তাঁর ক্ষমা প্রাপ্তিতে বঞ্চনা নিয়ে।" উম্ম আহমদ আরও বলেছেন, আমার মা আমাকে বলেছেন, "বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার শিষ্টাচার (আদব) বজায় রাখো। যে প্রকাশ্যে অশিষ্ট হবে-তাকে প্রকাশ্যেই শাস্তি দেয়া হবে। যে অভ্যন্তরে অশিষ্ট হবে, তাকে সেভাবেই শাস্তি দেয়া হবে। আয়েশা আরও বলেছেন, "একাকী অবস্থায় কারো নিঃসঙ্গতা অনুভূত হওয়ার অর্থ তার প্রভুর সাথে তার ঘনিষ্টতা কম।" আল্লাহর বান্দাকে কারোর তাচ্ছিল্য করার অর্থ সে বান্দার প্রভু সম্পর্কে তার ধারণা নেই। যে শিল্পীকে ভালবাসে সে তার শিল্পকর্মকেও সম্মান করে।" আয়েশা ৩৪৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

পুণ্যবান নারীর কবরের আলো

তিনি একজন আবেদা নারী ছিলেন। লোকেরা তাকে বাহিয়া নামে ডাকতো। মরার সময় সে আকাশের দিকে তাকিয়ে এই দোয়া করে, হে আল্লাহ, আমার পাথেয় আর অবলম্বন একমাত্র তুমি। জীবন-মরণে আমি তোমাতেই ভরসা করেছি। এখন মরার সময় আমাকে লাঞ্ছিত করো না আর কবরের আজাব থেকে আমাকে রক্ষা করো। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে প্রতি জুমা আর তার আগের রাতে মায়ের কবরের পাশে বসে কুরআনের আয়াত আর অন্যান্য দোয়া-দরুদ পড়ে মা ও অন্য কবরবাসীর আত্মার মাফের দোয়া করত। সে বলে, "একবার আমি মাকে স্বপ্নে দেখি। আমি সালাম দিয়ে তার অবস্থা জানতে চাই। মা বলেন, ছেলে, মৃত্যু যন্ত্রণা আর কষ্ট তো আছেই; কিন্তু আমি কেয়ামত পর্যন্ত উর্ধ্বালোকে বিচরণ করবো। সেখানে উৎকৃষ্ট গালিচা ও ঝলমলে রেশম শোভিত বালিশ রয়েছে।" আমি জানতে চাই, আপনার কোনো বস্তুর দরকার নেই? মা বলেন, ছেলে, এই যে তুমি আমার কবর জেয়ারত করো আর কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া-দরুদ পড়ো এটি কখনো বন্ধ করো না। জুমার দিন ও তার আগের রাতে তোমার আগমনে আমাদের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। বাহিয়ার ছেলে বলে, এরপর থেকে আমি প্রত্যেক জুমার দিন আর তার আগের রাতে নিয়মিত আমার মায়ের কবরের পাশে গিয়ে এই দোয়া করতাম, হে আল্লাহ, তুমি এখানকার সব কবরবাসীর ভয় দূর করে দাও, তাদের ভুলচুক মাফ করো, তাদের একাকীত্বের কষ্ট ভুলিয়ে দাও। তারপর একরাতে আমি স্বপ্নে দেখি, অনেক মানুষ আমার কাছে এসেছে। আমি প্রশ্ন করলাম, তোমরা কারা, এখানে কেন এসেছো? তারা বললো, আমরা

কবরবাসী। তোমার কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি। আমরা তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি, তুমি কবরের পাশে কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া - দরুদ বন্ধ করো না।

শাওয়ানাহ

শাওয়ানাহ উবুল্লায় বাস করতেন। তিনি একজন অসাধরণ নারী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার, সুরেলা। তিনি লোকদের উপদেশ দিতেন,তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাঁর কাছে যাহিদ, আবিদ, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যি[3], আহলে কলব এবং সাধকগণ আসতেন। একজন খাঁটি সাধক ও আল্লাহভীরু ছিলেন তিনি; নিজে যেমন কাঁদতেন, তেমনি অন্যকেও কাঁদাতেন। আবু আওন বলেছেন, শাওয়ানাহ এমনভাবে কাঁদতেন যে আমাদের শংকা ছিল তিনি অন্ধ হয়ে যাবেন।' আমরা বললাম, আমরা আশংকা করি আপনি অন্ধ হয়ে যাবেন।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমার কাছে পরকালে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে এই দুনিয়া কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাওয়াই পছন্দের।"

শাওয়ানাহ বলতেন, "যে চোখ তার প্রেমাস্পদ থেকে বিচ্ছন্ন হয়েছে, সে কি কান্না ছাড়া তাঁর সাথে দেখা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে? এটা তো শোভনীয় না।"

উবাইদা বিনত আবু কিলাব

উবাইদা বসরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি তুপাওয়াহ-এ থাকতেন। তিনি একইসাথে প্রাজ্ঞ, সাধক এবং হৃদয়গ্রাহী উপদেশদাতা ছিলেন। দাউদ ইবন আক মুহাব্বির বলেছেন, "উবাইদার ইন্তেকালের পর বসরা আর কখনো তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নারী তাঁর স্থলবর্তী করতে পারেনি।" উবাইদা বলেছেন, "যিনি খাটি তাকওয়া মা'রিফাহ অর্জন করেছেন, তার কাছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার চেয়ে পছন্দের আর কিছুই নেই।"

হাবিবা আল আদাভিয়্যাহ

হাবিবা বড় মাপের আরিফাদের একজন। তিনি বসরায় বাস করতেন। আবু মুহাম্মদ আল মাক্কি বলেন, 'হাবিবা এশার নামাজের পড়ে ছাদের ওপর দাড়াতেন। এরপর জামা-পায়জামা মজবুত করে পরে ওড়না পেঁচিয়ে নিতেন। বলতেন, "প্রভু আমার, তারকারা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, চোখেরা ঘুমিয়েছে , রাজা-বাদশারা তাদের তোরণ বন্ধ করে দিয়েছে, প্রত্যেক প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে নিয়ে নির্জনে চলে গেছে আর এই আমি আপনার সামনে দাড়িয়ে আছি। 'শেষরাতে বলতেন, 'প্রভু আমার! রাত তো চলে গেল, নতুন দিন চলে আসল। হায় যদি জানতাম ! আপনি কি আমাকে গ্রহণ করেছেন- তাহলে শান্তি পেতাম; নাকি প্রত্যাখান করেছেন- তাহলে ধৈর্য ধরতাম? আপনার মহত্তের কসম! যতদিন আমাকে বাচিঁয়ে রাখবেন, এটাই হবে আপনার ও আমার (মধ্যকার) অবস্থা। আপনার দরজা থেকে তাড়িয়ে দিলেও আমি যাব না- আমার হৃদয় তো জানে আপনি কত মহানুভব, কত উদার!

ফুতাইমা

ফুতাইমা ছিলেন হামদুন আল কাসারের স্ত্রী। তিনি সুউচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা ও বিরাট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ফুতাইমা বলেছেন, "জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সুফির আদর্শ হলো কেউ তার অভিমুখী হলে তাকে গ্রহণ করেন আবার কেউ কাছে না থাকলে ভুলে যান না; কেউ তার সঙ্গ নিলে তার সাথে খাপ খাইয়ে চলেন আবার কেউ অস্বীকার করলে তাকে সঙ্গ নিতে জোর করেন না।" ফুতাইমাকে প্রাজ্ঞ ব্যি[3]সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন,'তিনি এমন এক ব্যি[3], যার কাছে বসলে তিনি তোমার হৃদয় উজ্জীবিত করে দেন। ফুতাইমা বলেছেন, "যে নিজেকে চেনে তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য দাসত্ব, সে কেবল তার প্রভুকে নিয়েই গর্ব করে।'

তথ্যসূত্র:

- কারামাতে আউলিয়া- কুতুবেমদিনা ইমাম আব্দুল্লাহ ইয়াফেয়ী ইয়ামেনি।
- নারী সূফীদের জীবনকথা-আব্দুল্লাহ জুবায়ের কর্তৃক অনূদিত।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা

নূরে জান্নাত নাছরিন

মানবজাতি আল্লাহর এক অপরূপ সৃষ্টি। আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সেরা সৃষ্টি। পুরুষ ও নারী এ দুই শ্রেণির সম্মিলিত গোষ্ঠীর নাম মানবজাতি। মানব ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়েছে হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম-র মাধ্যমে। মানব সভ্যতা আজ হাজার বছর পার করেও যতটুকু বিকশিত হোক না কেন এর আদি কৃতিত্বের জন্যে যে শুধু আদম আলাইহিস সালাম-ই দাবিদার তা কিন্তু নয় বরং হাওয়াআলাইহিস সালাম ও কম অবদান রাখেননি। আর এই ধারাবাহিকতা গড়ে উঠেছে যুগে যুগে মানব সভ্যতার এক মহান ইতিহাস। কবি নজরুলের ভাষায়,

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

তবে ইসলাম আবিভার্বের পূর্বের জগত চিন্তা করলে আবহমানকাল থেকেই নারী অবহেলিত, নির্যাতিত, উপেক্ষিত ও বঞ্চিত। ইসলাম আসার পূর্বেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নারীকে সঠিক ও সুষ্ঠু কোনো মর্যাদা দেওয়া হয়নি এমনকি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেও অমুসলিম দেশ সমূহে নারীর নায্য অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করার জন্যে নারী জাতিকে সহ্য করতে হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী দুঃসহ লাঞ্ছনা।

এই ধরাতে ইসলাম আসার পূর্বে তথা আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে নারীকে বলা হতো, 'শয়তানের অঙ্গ' দংশনের নিমিত্তে সদা প্রস্তুত বৃশ্চিক। নারী জাতির ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন সেন্ট বানার্ড, সেন্ট অ্যান্টনি, সেন্ট পল-এর মত বিশ্ববরেণ্য ধর্মযাজক ও পুরোহিতগণ। তাদের অভিমত,নারী যখন আদি পাপের উৎস মানুষের জন্মগত পাপের কারণ তখন সকল ভৎসনা, অবজ্ঞা ও ঘৃণা নারীরই পাপ্য।

নারী জাতিকে নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের ও ধর্মযাজকের বক্তব্য:

(১) হিন্দু ধর্ম মতে, সমাজে নারী ছিল অশুভ প্রাণী। অধ্যাপক ইন্দ্রের ভাষায়, "নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নাই।" নারী প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ।

(২) চীনদেশে নারীর অবস্থা ছিল অধিকতর করুণ ও দুর্দশাগ্রস্থ চীনের ধর্মগ্রন্থে নারী নিয়ে বর্ণিত হয়েছে, 'দুঃখের প্রস্রবণ' হিসেবে।

(৩) বৌদ্ধধর্মের মতে, "নারীর সাহচর্যে নির্বাণ লাভ করা চলে না। নারী সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ।"

(৪) ইহুদিরা নারীকে সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ বলে গণ্য করত।

একমাত্র ধর্ম ইসলাম এসব অলীক ও ভ্রান্ত ধারণা নসাৎ করে দিয়ে নারীকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার আসনে অদৃষ্ট করেছেন। আরো ঘোষণা করেছেন, "হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম উভয়কে শয়তান প্ররোচিত করেছিল। উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এবং রাব্বুল আলামিন তাঁর সীমাহীন করুণায় উভয়কে ক্ষমা করে দেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, "এভাবে সে (শয়তান) তাহাদিগকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল।" তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করলেন, "আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি তোমাদিগকে বলি নাই যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তারা বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি। যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হইব"। (সুরা আ'রাফ: ২২-২৩)

ইসলাম এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক শিশু নিষ্পাপ হয়ে জগতে জন্মগ্রহণ করে এবং পাপ-পুণ্য কোন সহজাত সম্পদ নয়া পাপ-পুণ্য প্রত্যেক নর-নারীর অর্জিত বস্তু। যখন বিশ্বব্যাপী সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভোগের জন্যে, তখন মহানবি মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ উদার কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের তথা স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী। স্ত্রী হচ্ছে তার গৃহের সম্রাজ্ঞী।"

শুধু তাই নয়, কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইরশাদ করেছেন, "নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন-আছে তাহাদের ওপর পুরুষের।"(সুরা বাকারাহ: ২২৮)

ইসলামে নারীকে 'মুহসানাহ' অর্থ শয়তানের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংরক্ষিত, দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে, "তাহারা অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাহাদের অঙ্গাবরণ।" (সুরা বাকারাহ: ২২৮) এবং মহানবি ﷺ দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করেছেন, "বিশ্বে বহু অমূল্য সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সর্বক্রেষ্ট সম্পদ ধর্মপরায়ণ স্ত্রী।"

ইসলামের দৃষ্টিকোণে নারী যে কত সুমহান, উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত তা সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয় নারী চরিত্র সম্পর্কিত পবিত্র আল-কুরআনের বলিষ্ঠ সতর্ক বাণীতে, "যাহারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না,তাহাদিগকে আশিটি কশাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না; ইহারাই তো সত্যত্যাগী।" (সুরা নুর: ৪)

তাছাড়া মহানবি ﷺ'র সহিহ হাদিস, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।"

এই সুস্পষ্ট হাদিস দ্বারা ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মানকে সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করেছেন। সত্যিই ইসলাম নারীকে অধিকার দিয়েছেন জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, কন্যা হিসেবে।

নারী 'মা' নারী 'স্ত্রী'
নারী 'বোন-কন্যা'
নারী পুরুষের চলার পথের
উৎসাহ-অনুপ্রেরণা,
নারী ছাড়া পুরুষ,
পুরুষ ছাড়া নারীর
নাই কোন মূল্য।
সম্মান, ভালোবাসায়
একে অপরকে কর ধন্য,
করো না কেউ করুণা।

ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে হজরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু, হজরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু, হজরত ফাতিমা ﷺ, বিবি সকিনা ﷺ, জুবাইদা, হামিদা, রাবেয়া বসরী (র), চাঁদ সুলতানা, সুলতানা রাজিয়া প্রমুখ বিদুষী নারীরা জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে অসাধারণ অবদান রেখে যাওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনক যে, আজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মন্ধতা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতাও ইসলামের অপব্যাখ্যার দরুন মুসলিহ মহিলাদের বিরাট এক অংশকে অন্তঃপুরে বন্দী রেখে সমাজের বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে অপাঙক্তেয় করে রাখা হয়েছে। কবি নজরুলের ভাষায়,

"জরী শাড়ি পরা চকোলেট ওরা,
বন্ধ হেরেম বাক্সে।
বাহির করলে খেয়ে নেবে কেউ
কাজেই বাক্সে থাক সে।"

(চন্দ্রবিন্দু, নজরুল রচনাবলি, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা ১৪৫)

প্রসঙ্গত ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শালীনতা ও আব্রু অক্ষুণ্ন রেখে মুসলিম মহিলাগণ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে অন্ধত্ব, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর শিকার হয়ে নারীকে গৃহবন্দী বা গৃহের অন্তরালবর্তিনী হতে হয়েছে, আজো হচ্ছে।

একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, নারী করুণার পাত্রী নয়। সমাজ ও বৃহত্তর স্বার্থেই নারীকে তাদের প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। একথাও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান বিশ্বেও নারীর অবদান অপরিসীম, অতুলনীয়।

নারী জাতির উন্নয়ন লক্ষ্যে, নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে, বহুবিধ বিধি-বিধান রচিত হয়েছে। কিন্তু, বস্তুতপক্ষে কোন বিধিবিধাই সফলভাবে কার্যকর হয়ে উঠবে না, যদি কিনা ইসলামের আলোকে সহমর্মিতা, উদার মনোভাব ও ঐকান্তিক ক্রদ্ধাবোধ সহকারে নারীর প্রকৃত মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখা হয়। এ পথ অনুসরণেই আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম দ্বীন ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত নারীর পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার সমাজের প্রতি অঙ্গ ও অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তবেই অনুরণিত মনীষী।

Pierre Crabites-অমর উক্তিঃ
Muhammad was the greatest champion
of women's rights the world has ever seen.

সায়েন্স ফিকশনের গোড়াতে মুসলিমদের কৃতিত্ব

খায়রাতুন বিনতে বাবুল মিথিয়া

বিশাল এক ডাইনির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মায়ের কাছ থেকে শোনা গল্পের মতোই ভয়ঙ্কর। চেহারা দেখে ভয়ে শরীর কাঁপছে,সেই সঙ্গে মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন জড়ো হচ্ছে। এই শহরের নিয়ম হলো নারীদের কোনো ভুল নজরে এলেই তাদের ডাইনি বলে আখ্যা দেওয়া আর শাস্তিস্বরূপ শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। নিজের চোখের সামনে এই অন্যায় দেখে বহুবার প্রতিবাদ করতে চেয়েও নিরুপায় হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু আজ স্বচক্ষে যা দেখছি তাতে প্রথমবার মায়ের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলো। সত্যি কি তাহলে প্রেতাত্মা বা ডাইনি আছে আর মায়ের সাথে কি এদের কোনো সম্পর্ক আছে? কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঔষধের থলে নিয়ে মা হাজির হলেন, আমায় দেখে দ্রুত বাইরে নিয়ে এলেন.....

যারা কমবেশি কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন পড়েন তারা গল্পটির সঙ্গে কেপলারের 'সম্নিয়াম' লেখার কিছুটা মিল খুজে পাবেন। সম্নিয়াম, যার অর্থ কল্পনা। কেপলার এতে চন্দ্র অভিজানের কল্পনা করেন। এখানে নায়কের বাবা-মায়ের সঙ্গে আত্মা-প্রেত্মাদের যোগাযোগ ছিলো এবং পরবর্তীতে নায়ক তাদের কাছ থেকে মহাকাশ ভ্রমণের কৌশল আয়ত্ত করে নেয়। কিন্তু এই লেখাই তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ায়। কেপলারের মা ঔষধ ও বিভিন্ন পথ্য বিক্রি করতেন। এই সুযোগে কেপলারের বিরোধিরা বইটিকে তারই মায়ের ডাইনি হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দায়ের করে এবং শাস্তিস্বরূপ তার মাকে অন্ধ কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। সেই সময় ধর্মযুদ্ধের কারণে কেপলারে সায়েন্স ফিকশন তার জন্যেই বিপদ ডেকে আনে। বিজ্ঞানী হিসেবে কেপলার তার কাজের মাধ্যমে নিজের মাকে বাঁচানোর সাথে সাথে সমাজকে কুসংস্কার হতে বের করে আনেন। সাধারণত একেই কল্পবিজ্ঞানের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু কেপলারের বহু বছর আগে থেকেই মুসলিম বিশ্বে সায়েন্স ফিকশনের চর্চা হয়ে আসছে। শুনতে অবাক লাগলেও সত্য যে, ইসলামি ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের স্বর্ণযুগটিকে ইসলামি সায়েন্স ফিকশনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। পশ্চিমাদের একচেটিয়া অধিকার, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি আর ইসলাম সম্পর্কিত সঙ্কীর্ণ মনোভাবের দরুন আজও এসব লেখার বেশিরভাগ পশ্চিমা সাহিত্যে অপরচিত।

সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞান বলতেই আমরা সাধারণত ভিনগ্রহের প্রাণী, ভবিষ্যতে যাওয়া বা রোবট ইত্যাদি বুঝি। যেখানে বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ, সময় সব মিশে আমাদের সাধ্যের অধিক কল্পনা করতে শেখায়, আর সেই কল্পনায় ইসলামের বিভিন্ন মুজেজা মুসলিম সাহিত্যিকদের রসদ যুগিয়ে এসেছে। ফলে সায়েন্স ফিকশন শুধু ভীনগ্রহী প্রাণী বা সময় ভ্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করেছে। এছাড়া কোরআনে উল্লেখিত বিভিন্ন মোজেজা মুসলিম লেখকদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। যদিও অনেকে সায়েন্স ফিকশনকে পাশ্চাত্য সাহিত্য বা আজগুবি কল্পনা বলে অভিহিত করেন। অবশ্য তা আরবি গল্পের বেশি অনুবাদ না হওয়ার কারণে এই ধারণার জন্ম হয়েছে বলে মনে করেন সায়েন্স ফিকশন সংশ্লিষ্টরা।

মেরি শেলীর 'ফ্রাঙ্কেস্টাইন' বইটিকে প্রথম সার্থক সায়েন্স ফিকশন বলা হলেও 'এ ট্রু হিস্টোরি' যা একজন সিরিয়ান লেখক দ্বিতীয় শতকে চাঁদে ভ্রমণ নিয়ে কল্পকাহিনী লেখেন এবং এটি মেরি শেলীর বহু শতাব্দী পূর্বেই রচিত হয়েছে। নবম শতকে আল ফারাবির লিখিত 'মাবাদিয়ুল আহল আল

মাদিনাতুল ফাদ্বিলাহ' বইটি অন্যতম। এছাড়াও 'আল রিসালাহ আল কামিল ফি সিরাতিল নবি' গ্রন্থটি প্রাথমিক কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম একটি উদাহরণ। বারশ শতকে রচিত ইবনে নাফিসের এই উপন্যাসটিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সত্যকে কল্পনা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া এটি প্রাথমিক দর্শন সাহিত্যেরও অন্যতম নজির। একই উপন্যাসের মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন যা সেই যুগের অনন্য সৃষ্টি। মুসলিম সমাজের মধ্যে সুন্নিয়তের ধারা ও নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনাই ছিলো তার প্রধান উদ্দেশ্য। উপন্যাসটিতে কামিল নামক এতিম কিশোরের মরুদ্বীপ হতে সভ্য দুনিয়ায় আসা এবং সেখানে এসে স্বশিক্ষিত হয়ে নিজের যুক্তিবোধ দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় উন্মোচন নিয়ে বর্ণনা করা হয়। কিয়ামতের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তিনি রচনাটিকে যে পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন তা কল্পবিজ্ঞানের প্রাথমিক উদাহরণে পরিণত হয়েছে।

তবে, এসব নিয়ে পর্যালোচনার অভাব ও ভাবধারার অপরিবর্তনের ফলে ইসলামি সায়েন্স ফিকশন এখনো স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই রচনাবলির ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিমা বিশ্বের অনেক বিখ্যাত চরিত্র ও রচনার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু বছর ধরে এই বৈশিষ্টগুলোই সকল ধারার লেখকদের রসদ যুগিয়েছে। বলা যেতে পারে ইসলামিক আদর্শের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও ধর্মকে রক্ষার এক অন্যতম মাধ্যমই হলো সায়েন্স ফিকশন। তবুও বর্তমানে মুসলিম সমাজের দুর্দশা সত্ত্বেও এই মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে বহু লেখক লিখে চলেছেন তার স্বপ্নের গল্প।

সচেতন নারী সমাজের গর্ব

জিনাতুননেছা জিনাত

নারীর সচেতনতা প্রসঙ্গে যাবার আগে শুধু 'সচেতনতা' শব্দটি সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। 'সচেতনতা' একটি শব্দ মাত্র কিন্তু এর ব্যাপকতা বিশাল। হোক সেটা কোনো দূষণের প্রতিকার বা প্রতিরোধ, অথবা পরিবেশ আন্দোলন অথবা রাস্তাঘাটে যানজট নিরসন প্রসঙ্গে।

আপনি বা আমি যদি ব্যক্তিভাবে সচেতন নাগরিক হই তাহলে নিশ্চয়ই কোনো কাজ করার আগে সেই বিষয়টির ক্ষতিকর দিকটি সম্পর্কে জেনে সচেতন হব। অবশ্যই এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয় যেমন পরিবেশ আন্দোলনের যদি হাজারটা পথ থাকে তার মধ্যে অবশ্যই এক নম্বর হবে সচেতনতা। ধরুন একজন নারী-সাংবাদিক একটা দুর্গম এলাকায় সন্ত্রাসীদের ধরা পড়ার বিষয়ে খবর সংগ্রহ করতে যাবেন; তিনি সেখানকার ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরাময়ের উপায়টি সম্পর্কে যদি আগেই জেনে রাখতে পারেন, তাহলে অবশ্যই তার ঝামেলা কম হবে।

সমাজ গড়ার কারিগর হিসেবে একাডেমিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি সময় পেলেই শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয়, নৈতিক বা সামাজিকভাবে সচেতন করার চেষ্টা করি। তাতে যে মুহূর্তেই সবাই সচেতন হয়ে যায় তা নয়, তবে কেউ কেউ তো অবশ্যই হয় এবং সেটিই মানুষ হিসেবে সার্থকতা।

কয়েকদিন আগে খুব ভোরে একজন ভদ্রমহিলা ফোন করে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আমাকেই চায়ছেন এটি নিশ্চিত হবার পর কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, "আপা, আপনি গতকাল ক্লাসে কী বলেছিলেন আমি জানি না, তবে আমার মেয়েটাকে আজ ভোরবেলা উঠে ফজরের নামাজ পড়তে দেখেছি। যে কাজটা আমি ষোল বছরে পারিনি সেটা আপনি করেছেন। মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে সে আপনার কথা বললো। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ!"

ব্যাপারটি ঠিক এমনই, আমরা পজিটিভ কথা বলে অন্যকে সচেতন করতে পারি অথবা অন্যের দ্বারা নিজে সচেতন হতে পারি। যেভাবেই হোক, সচেতনতা ছাড়া কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্তনের এটি একটি প্রধানতম উপায়ও বটে।

এবার একটি বাস্তব ঘটনা বলি; আমার একজন অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রী মেডিকেল এ চান্স না পেয়ে লিখেছিল, "আমার এখন কী করা উচিত? কান্না? নাকি সুইসাইড?

I have got 174.75, নিজের চেষ্টায়... " আমার এগারো বছরের শিক্ষকতা জীবনে যদি দশজন অতি মেধাবী শিক্ষার্থীর নাম নির্ধারণ করতে হয়,তাহলে তাদের মধ্যে 'সুমাইয়া আহমেদ' অবশ্যই অন্যতম একজন নাম। কিছু খাতা থাকে যেগুলোতে চোখ বন্ধ করে পূর্ণ নম্বর দেওয়া যায়, চোখের সামনে এখনও তার সেই নির্ভুল নিঁখুত লেখাগুলো ভাসছে...!

সন্ধ্যায় সুমাইয়ার মন খারাপ করা লেখাগুলো দেখে খুব অস্থির লাগছিল! সারা বছরের পরিশ্রম আর নিজের চেষ্টায় যে নম্বর সে পেয়েছে, সেটা কি আসলেই যথেষ্ট নয়? কে দেবে তার এই প্রশ্নের উত্তর? রাগে-অভিমানে চোখ ফেটে পানি আসছে! কি বলব আমি ওকে? অবশেষে আমি ওকে লিখলাম, "সুমাইয়া কে বলছি, একটা কথা মন দিয়ে শোনো, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর পছন্দ মত জায়গায় নিতে চান, ভাল কিছু দিতে চান, তাদের কে তিনি সাময়িক কিছু কষ্ট দেন। সুদিন অবশ্যই আসবে। জীবনের জন্য পড়াশোনা, পড়াশোনার জন্য জীবন নয়! জীবনটা

অনেক দামী। কোথাও পালিয়ে গিয়ে কি কোনো সমস্যার সমাধান করা যায়?

বাবা মা কষ্ট পাচ্ছে ভেবে তুমি সুইসাইড এর কথাটাও মুখে এনে ফেলেছ, অথচ তুমি না থাকলে তারা কি এ জীবনে আর এক মুহূর্তের জন্যও ভাল থাকতে পারবে?

ধৈর্য ধর মা, আল্লাহর কাছে চাও। মন থেকে তাঁর কাছে চাইলে তিনিই কেবল পারেন তোমাকে এই কঠিন সময়পার করে একটা সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যতএবং জীবনের স্বপ্নকে সত্যি করে দিতে।" সুমাইয়া আর সুইসাইড করেনি, সফলভাবে বেঁচে আছে।

আমি আমার সন্তানতুল্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এভাবে দোয়া করি, "তোমরা প্রত্যেকে এক-একজন নির্ভেজাল ভাল মানুষ হও। তার শুরুটা কিন্তু এখন থেকেই করতে হবে। স্বপ্ন দেখবে আকাশ ছোঁয়ার, আর যত আঘাতই আসুক না কেন, কিছুতেই স্বপ্নগুলোকে হারিয়ে যেতে দেবে না! খুব কঠিন কিছু নয়, পজিটিভ চিন্তা করবে সব সময় আর ভাল কাজের ইচ্ছাটিকে মনের মধ্যে লালন করবে, হোক সেটা ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বা নিতান্তই নগন্য।

তোমার ফেলে দেওয়া কলার খোসায় যেন কোনো পথচারীর পা না ভাঙ্গে, ভুল পথে চালিয়ে নেওয়া গাড়িটার জন্য কোনো দূর্ঘটনা না ঘটে আর এমন কোনো ভুল কাজ যেন কোনদিন আল্লাহ তোমাদের না করান, যার কারণে কেউ আঙ্গুল তুলে বলতে পারে এমন ছেলে বা মেয়ে থাকার চেয়েনা থাকাই ভাল ছিল!"

অনেকেই সমাজের অনেক নামী-দামী মানুষ হয়েছে। অনেক মানুষকে অনেকভাবেই সচেতন করতে পেরেছি। নিজে এখনও অন্যের কাছ থেকে সানন্দে ভালো কিছু করার জন্য পরামর্শ নিই। আমরা নারীরা পরিবারের, সমাজের প্রায় অর্ধেক অংশ, তবে কেন আর পিছিয়ে থাকবো। আসুন আজ থেকেই না হয় সবাই যার যার অবস্থান থেকে সচেতন হই। বলা তো যায় না, আপনার বা আমার সচেতনতাই হয়তো নির্মুল করতে পারবে সমাজের অন্ধকার পথগুলোকে!

রাহে ইশ্‌ক

ছালেহা দেওয়ান

সৃষ্টির রহস্য না জানি আমি, না জানো তুমি। প্রেমের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছে সে। এ পর্দার বাহিরে ও ভেতরের রহস্যও আমাদের অজানা। তবুও পিপাসার্ত হৃদয় পর্দার আড়ালে থাকা সে প্রিয়তম পবিত্রসত্তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। তার প্রেমের আকর্ষণেই তো সমগ্র সৃষ্টি আপন আপন জায়গা থেকে কাজ করে যাচ্ছে। কবি মীর তকি এর ভাষায়-

"মুহাব্বাত সে হে ইন্তেজাম এ জাহা
মুহাব্বাত সে হে গার্দিশমে হে আসমা।"

-"এ পৃথিবীর যত আয়োজন, সব-ই তো প্রেমের জন্য।
প্রেমের আকর্ষণেই আকাশ চক্রাকারে ঘুরছে।"

সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়; প্রকৃতপক্ষে, সে পবিত্রসত্তা মহান প্রভু-প্রেমের জন্যই এতসব আয়োজন করেছেন। নিজ হাবিব ও মাহবুব-হুজুর পাক ﷺ এর প্রশংসা ও প্রেমের উপাখ্যানস্বরূপ লিখেছেন পবিত্র কুরআন। ড. আল্লামা ইকবাল (রাহ.) এর ভাষায়-

জুনুন-ই ইশক ছে খোদা
ভি না বাচ ছাকা 'ইকবাল'
তারিফ-ই হুসনে ইয়ার মে সারা কুরআন লিখ্ দিয়া

- ইশকের মাস্তি থেকে খোদাও অবশিষ্ট রইলো না 'ইকবাল',
বন্ধুর (হুজুর পাক ﷺ'র) প্রশংসায় পুরো
কুরআনই লিখে দিলেন।

ইশকের সর্বপ্রথম প্রেমিক তো খোদা নিজেই। বন্ধুর (হুজুর পাক ﷺ এর) প্রেমে কেবল সবকিছু সৃষ্টি করে ক্ষান্ত হননি, বরং সৃষ্টির সবকিছু কে হুজুর পুরনূর ﷺ এর আজ্ঞাবহ করে দিয়েছেন। তাই তো কোন কবি বলেছেন-

"খালেকে কূল নে আপকো মালিকে কূল বানা দিয়া,
দোনো জাহাঁ হ্যাঁয়
আপ কি কাবজাহ অওর ইখতিয়ার ম্যাঁয়।"

-"হে রাসুল ﷺ, সকলের মালিক (স্রষ্টা),
আপনাকে সকল সৃষ্টির মালিক করে দিয়েছেন।
এই উভয় জগতই, তিনি আপনার আওতা ও
নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন।"

প্রিয় রাব্বুল ইজ্জত নিজেও আপন মাহবুবের প্রেমে সিক্ত হয়েছেন, সেই সাথে সমগ্র সৃষ্টি কে তাঁর (ﷺ) প্রেমের লজ্জত নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আদম সন্তানের হৃদয়ে সেই মুনিব রাসূলে আকরাম ﷺ'র ইশকের বীজ বপন করে দিয়েছেন। সেই সাথে প্রিয় নবিজি ﷺ এর মোহব্বতের মাধ্যমেই নিজের মোহব্বতকে সংযুক্ত করেছেন আদম সিনায়।

তাই তো আদম সন্তান ভূমিষ্টের পর কান্না করে সে মোহব্বতের কথাই জানান দেয়। অতঃপর সে ইশকের বীজ নিয়ে আদম সন্তান অবচেতন মনেই দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় প্রেমের কাঙ্গাল হয়ে। খুঁজে ফেরে তার হৃদয়ের গোপনতম প্রকোষ্ঠে থাকা বিরহ বেদনার ঔষধকে। আর আর্তনাদ করে ফেরে এই বলে, হে আমার প্রভু, ব্যথার দীর্ঘ প্রহর শেষ করো। এবার তো আমার হৃদয়ের ব্যথাতুর উপত্যকায় মিলনের চাঁদ উদিত করো। এবার ক্ষান্ত করো আমায়, সিক্ত করো আমায় তার দিদার দিয়ে।

রাহে ইশকে এভাবেই চলতে থাকে প্রেমিক। দিন যায় রাত আসে। প্রেমিকের ব্যাথা বেদনার সমাপ্তি ঘটে না। গভীর রজনীতে দাঁড়িয়ে যায় তাঁরই সম্মুখে। তার জন্য হৃদয়ে ক্ষরণ হওয়া রক্ত দিয়ে অজু করে, ইশকের জায়নামাজে দাঁড়িয়ে যায় আবার। আবার শুরু হয় বুক ফাটা আর্তনাদ। চলতে থাকে তা দীর্ঘ সময় ধরে। সকল ব্যাথা-বেদনার ফর্দ নিয়ে ঝুঁকে যায় তার দিকে।

অসহনীয় সকল কষ্ট তার কুদরতি কদমে ঢেলে দেয়। নিয়ে আসে অনুপম প্রশান্তি।

এবার সে প্রেমিক শান্ত হয় ক্ষান্ত হয়। অতঃপর কিছু সময় অতিক্রম না হতেই শুরু হয় বন্ধুর বিরহ। খুঁজতে থাকে এ ব্যাথার ঔষধ। কোথায় সে ঔষধ? এ ব্যাথা যে সামান্য নয়। কবির ভাষায়-

"বন্ধুর বিরহ নহে সামান্য কখনও,
অতি সূক্ষ্ম বালিকনা সহে না নয়ন।"

কীভাবেই বা সইবে? এ যে ঐশী প্রেম। যা ধীরে ধীরে আদম সন্তানকে রত্ন সমতুল্য করে। এ ইশকের রং যে আশেকের আপাদমস্তক আদবের সাজে সজ্জিত করে। দেয় ঐশী জ্ঞান। এভাবেই শুরু হয় এ পথের প্রকৃত সায়ের বা ভ্রমণ। এ ঐশী জ্ঞান ও ঐশী প্রেমের আলমে যে যত বেশি উর্ধ্বে আরোহন করে। সে তত বেশি একা হয়ে যায়। কেননা এ ইশক দুনিয়ার সকল চাহিদার বিপরীতে অবস্থান করে। তাই এ পথে আশেকদের উন্নতি তাদেরকে জাগতিকভাবে একা করে দেয়। কারণ তাদের মাস্তের জগতে ভোগবাদী মানুষের স্থান হয় না। কারণ তারা রাহে ইশকের পথিক।

ধুলির ধরা থেকে অনন্তকালের যাত্রায় কেবল মাশুকের স্মরণ ও তার বিরহ বেদনাই তাদের একমাত্র পাথেয়। রাত যায় দিন আসে। সময়ের স্রোতের দোলাচলে এভাবেই যুগ যুগ কেটে যায়। অতঃপর ফুরিয়ে আসে প্রেমিকদের নিঃশ্বাসও। তবু যেন রাহে ইশকের সফর শেষ হয় না। শেষ হয়ই বা কি করে? এ সফর তো শেষ হবার নয়। এ সফরের গন্তব্য একটাই। প্রিয় মাহবুব বা মাশুকের দিদার। ইশকের বিমারীদের ব্যথার ঔষধ তো কেবল একটাই।

প্রিয় মাশুক! তুতীয়ে হিন্দ খ্যাত বিখ্যাত সুফি কবি, হজরত আমীর খসরু (রাহঃ) এর ভাষায়-

Oh
You Ignorant Physician!
Leave From My beside.
The Only Cure For The Patients Of Love
is The Sight Of His Beloved.

অতঃপর এ বিমার নিয়েই তারা এ জগত ত্যাগ করে প্রফুল্ল চিত্তে। কারণ মৃত্যু তো বন্ধুর সাথে বন্ধুর দিদারের সেতুস্বরূপ। প্রেমের পর্দার অন্তরালে থেকে মাহবুব তার মুহিবকে আহ্বান করতে থাকেন। আর সে সময় মুহিব ব্যকুল হয়ে তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন তারই দিকে।

মরুর দুলালের আগমনী

জোয়াইরিয়া বিনতে আজিজ

পরম মধুর নাম গো রাসুল ﷺ
খোদারই করুণা,
ধরণী মাঝে আসুক খুশি
তোমারই মোহনা!
আমি বিমোহিত হৃদয়ে, পরম প্রণয়ে
জপেছি সে নাম, হে হাবিব!
তুমি দিদার দাও গো,
মরণে আসো, খুশি হবো এ গরিব!
হরদম নাম-পরিচয় জেনেছি তোমার
জপেছি তোমারই সে নাম!
গরিব কবি তোমারই দানে প্রাপ্ত
বলো চাইবে কিসের দাম?
তোমারই জন্মে ধর্ম এসেছে
খুব একটি দিবসে,
মোরা উদযাপনে দিনটি বৈ কি
আসুক ভালোবেসে!
তোমার ভালোবাসায় প্রিয়নবি
প্রভু বলেছেন, আনুগত্য!
তুমি মহান, তুমি দয়াবান
তুমি নুর এ সত্য!
তুমি মরুর দুলাল গো
মা ফাতেমার পিতা,
হজরত আলীর প্রাণের খনি
আর হাসনাইনের দাতা!
এ গরিবের ঘরে দুটি
খেজুরের দানা আনি,
উদযাপন করে দরুদ গেয়ে
নবিজির আগমনী!
সন্ধ্যা তারাও হার মেনেছে দেখো
পুব আকাশে ধ্রুবতারা,
নুর নবিজি তশরিফ আনুক
সত্যের জয়ে ধরা!
রহমতের বন্যায় ভেসে যবে কুল
দরিয়ায় মাঝি ডাকে,
'আসসালাতু আসসালামু আ'লা
ইয়া রাসুলাল্লাহ' হাঁকে!
সায়্যিদা আমীনার কোলে
হাসে নুর-নওজোয়ান,
জেহেল, লাহাবের ভ্রাতুষ্পুত্র
কাঁদে ফিহর-আদনান!
সুফিয়ান তার কন্যাদানের
বড়ো আশায় আজ,
নুরকে বরণ করতে তালিব
নিলো জমক সাজ!
তালাআ'ল বাদরু আ'লাইনা বলে
মাদানী মুন্নী কাঁদে,
হিজরতেরই পথ চেয়েছেন
মুহাজির হয়ে যেতে!
এই তব গৌরবের ধরা
মায়ার গাঁথুনি বলে,
মিলাদের ডাকে ঘুচবে আঁধার
কিয়ামের দলে দলে!

বসুমতীর কৃতজ্ঞতা

জান্নাতুল মাওয়া সাঈমা

প্রথম বসন্তের দিন বারোয়
বসুমতী লভিল আপনায়
যবে আচ্ছন্ন সে আঁধার তমসায়।

অভ্যর্থিলো বসুমতী সাদর দিল্ দরিয়ায়
রেখেছিলেন যেন তারে শতক্ষণ অপেক্ষায়
কায়েনাতকুল মাতিলো দফ বাজনায়।

ফরমালো বসুমতী সমস্ত সৃজনে
সাজো, মাতো, উল্লাসো
মোস্তাফার ﷺ শুভাগমনে ।

আজ্ঞামতো বৃক্ষরাজি
সারলো আপনা কারসাজি
সাজলো ফুলে ফুলে,
পল্লবিত পল্লবে
ছড়াল রঙিন আভা বিপুলা এ ভবে।

আপনি যেহেতু
বসুমতীর সৃজনের হেতু
অননুভবনীয় কুল মাখলুকাত
ব্যতিরেকে আপনার ।

বসুমতী মানায়, মিলাদ তাই
আপনারই কৃতজ্ঞতায়।
এই জ্ঞাপন,
রবে আজীবন
করতে রেজামন্দি হাসিল
রব্বে দুজাহাঁর।

একটু ছোঁয়ায় পাগলপারা
জগৎবাসী মাতোয়ারা
আপনিই তমসালগ্ন দূরকারী মহীয়ান
সালাম সহস্র
দরুদ অজস্র
হে বিজয়ী, মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ।

নুর নবিজির আগমন

সাদিয়া জান্নাত মুনমুন

জাহেলিয়াত যুগটা যেন
অন্ধকারে ভরা,
অত্যাচার আর জুলুমবাজে
সমাজ ছিল গড়া।
কুসংস্কারের গোঁড়ামিতে
মানুষ ছিল মত্ত,
দেব দেবতার পূজাটাকে
ভাবতো তারা সত্য।
আগুন কিংবা গাছ পালাকে
ঈশ্বর বলে মানতো,
কন্যাশিশু কবর দিতে
হতো নাতো ক্ষাণত।
পৃথিবীর এই বিপদ কালে
খুশির জোয়ার ওঠে,
নুর নবিজির আগমনে
নুরের আলো ফুটে।
জগৎ জুড়ে দরূদ পড়ে
হুজুর পাকের নামে,
অসৎ পথের হয় অবসান
সৎ পথেরই কামে

আঁধারে ধরণী

কুনছুমা বাবর মুন্নি

আঁধারে ঘিরেছে ধরণীর গায়
আঁধারে ডুবে ডুবে, যেন যায়,
দয়ার বারি কর বর্ষণ
হে খোদা, তোমার দয়ার মহিমায়।

গুনার পাহাড় যে কত গড়িয়াছি
গজবে তাহার হয় আহাজারি,
নিত্য নতুন যেন তার বিরাম নাই
তবু তোমার তো দয়ার সীমা নাই।

দেশজনে- দশমনে দাও সুবিচার
দূর করে দাও অন্যায় অত্যাচার,
হে খোদা, বাঁচাও আমাদের,
নতুন প্রজন্মের জ্ঞানে দাও প্রসার।

ওরা আমাদের বোন ও আমাদের ভাই,
অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতার লোভে,
যারা করে তাদের হাতিয়ার,
খোদা তুমি করো তাদের বিচার।

নবি তুমি আসছো ধরায়

লাফিফা নূর ইতি

নবি তুমি আসছো ধরায়
মন আমার ক্লান্তি হারায়,
এ কেমন খুশির জোয়ার
খুলে দিলো প্রেমের দুয়ার।

যার নামে আঁধার কাটে
তাঁরই নামে পুষ্প ফোটে,
যারি লাগি রব্বে কারিম
বানালেন আরশে আজিম।

নদীর কোলে টলমলে ঢেউ
শিশির ভেজা মিষ্টিলতা,
বৃত্ত চাঁদের স্নিগ্ধ আলো
নবি তোমার পাগল পারা।

নবি তুমি আসছো ধরায়
মনে আশার প্রদীপ জ্বালায়,
তোমার নুরের আলো দিয়ে
তিমির ভুবন উঠবে সেজে।

বিশেষ পদ্ধতিতে তাজবিদ শিক্ষা

আল-বাতুল টিম

ক্বোরআন শরীফের পরিচিতি

ক্বোরআন শরীফ হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থ যা রাসুল ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ। যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান হতে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক সূত্রে অবতারিত।

ক্বোরআন শরীফ হচ্ছে আল্লাহর বাণী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবি ও রাসুলদেরকে আসমানী কিতাবসহ প্রেরণ করেছেন। আল ক্বোরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন।

ক্বোরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

ক্বোরআন শিক্ষা অর্জন করে যত বেশি পাঠ করা যায় বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশ তত বেশি তরান্বিত হয়।

• আল্লাহর প্রিয় রাসুল ﷺ জ্ঞান অর্জনকে ফরজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। রাসুল ﷺ এরশাদ করেন-

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য (ক্বোরআনের) জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।'

• হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করার জন্য ক্বোরআন শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন-

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (رَوَاهُ بُخَارِيْ)

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞানী লোক হচ্ছেন তিনি- যিনি নিজে ক্বোরআন শিক্ষা করেন এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেন"।

• পবিত্র ক্বোরআন মাজীদ প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের হৃদয়ে থাকা প্রয়োজন। এবং তা তিলাওয়াত করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। তিলাওয়াত বলতে শুধু পাঠ করা নয়, এর অর্থ হচ্ছে অধ্যয়ন করা, অনুসরণ করা। মানুষের হৃদয়ে কিংবা স্মৃতিতে যদি মহা গ্রন্থ আল- ক্বোরআনের জ্ঞান না থাকে তাহলে সেই হৃদয় সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ এরশাদ করেছেন-

" إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ "

যার হৃদয়ে ক্বোরআনের সামান্যতম অংশ নেই, তার হৃদয় হচ্ছে বিরান বাড়ির মত। (তিরমীজি শরীফ)

• অপর এক হাদিসে এসেছে-

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ

-"তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিয়ে নিওনা"।

উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, কবরস্থানে যেমন নীরব নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, মুর্দাগণ কেবল শুয়ে আছে, কোন নড়াচড়া নেই, প্রাণের স্পন্দন নেই, তেমনি যে ঘরে নিয়মিত নামাজ আদায় হয় না, পবিত্র ক্বোরআন পাঠ হয় না, ক্বোরআনের অধ্যায়ন হয় না, সেই ঘরটি কবরস্থানের মত নীরব নিস্তব্ধ। সেই ঘরের মানুষগুলো সবাই মৃত।

• ক্বোরআন তিলাওয়াত নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বক্রেষ্ঠ ইবাদত। এ মর্মে মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন-

«أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَأَءةِ الْقُرْآنَ»:

-"নফল ইবাদতের মধ্যে ক্বোরআন তিলাওয়াত ক্রেষ্ঠ ইবাদত"।

• আল্লাহর রাসুল ﷺ আরও বলেছেন, 'তোমরা ক্বোরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা স্বীয় পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে।'

• যে ব্যক্তি দক্ষতার সাথে, উত্তমরূপে ক্বোরআন তিলাওয়াত করে, সে আমলনামা লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত ফিরিশতাদের সঙ্গী হবে।

• ক্বোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের পাষাণ মন বিগলিত হয়, সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং জীবনের উন্নতি সাধিত হয়। পক্ষান্তরে ক্বোরআন মাজীদের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা প্রদর্শনের কারণে হতভাগ্য ও লাঞ্চিত হয়। সুতরাং পবিত্র ক্বোরআন শিক্ষা করা, তদানুয়ায়ী আমল করা এবং যথোপযুক্ত আদব, মহব্বত ও ভক্তির সাথে প্রত্যহ ক্বোরআন মাজীদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা উচিত। যাতে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করা যায়।

তাজবীদ কী

পবিত্র ক্বোরআনুল কারীম বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার জন্য কতিপয় বিধান রয়েছে। এর সমষ্টিই علم التجويد

তাজবীদ শব্দের অর্থ হচ্ছে সুন্দর করা, সৌন্দর্যমন্ডিত করা বা সাজানো ইত্যাদি।

• যে বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ক্বোরআন শরীফ স্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা যায় তাকেই ইলমে তাজবীদ বলে।

তাজবীদ শিক্ষার উদ্দেশ্য

ইলমে তাজবীদ অধ্যায়নের পিছনেও কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা- শব্দগত ও অর্থগত উচ্চারণের বিকৃতি হতে ক্বোরআন মাজীদকে হিফাজত করা, বিশুদ্ধভাবে ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তোষ অর্জন করা এবং দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তির পথ প্রশস্ত করা।

তাজবীদ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পবিত্র ক্বোরআনুল কারীম বিশুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করার জন্য علم التجويد এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً (الْمُزَّمِّلْ)

অর্থাৎ "ক্বোরআন শরীফ তাজবীদ অনুসারে পাঠ করা"।

রাসুলে পাক ﷺ অশুদ্ধভাবে ক্বোরআন তিলাওয়াতকারী সম্পর্কে সতর্কবাণী দিয়ে বলেছেন-

رُبَّ قَارِىءٍ لِلْقُرْآنَ الْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

"বহু সংখ্যক ক্বোরআন তিলাওয়াতকারী রয়েছেন যাদেরকে ক্বোরআন শরীফ লা'নত করে।"

তাজবীদের বিপরীত ক্বোরআন তিলাওয়াত করলে গুনাহগার হবে, যার দরুন সাওয়াবের পরিবর্তে শাস্তি পাবে।

বিজ্ঞাপন দিন-

• ভেতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা-কালো) - ৩০০০ টাকা
• ভেতরের অর্ধেক পৃষ্ঠা (সাদা-কালো) - ১৫০০ টাকা

যোগাযোগ করুন-

01617-525496 (বিকাশ পার্সোনাল)

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

Email: albatul1442@gmail.com

ফেইজবুকে আমরা-

আল-বাতুল

শাহ সিমনান হজ্ব কাফেলা

ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস

(হজ্ব, ওমরাহ ও বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের টিকেটের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
হজ্ব লাইসেন্স নং ৮৩৬/১৭০ এবং ওমরাহ লাইসেন্স নং-৫১৩

হজ্বে গমনেচ্ছু ভাই বোনদের জানাই

খোশ আমদেদ

সামর্থবানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা বাইতুল্লাহের হজ্ব
ফরজ করেছেন (আল কোরআন)
হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
আপনার উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম

বুকিং চলছে

শাহ সিমনান হজ্ব কাফেলা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস
SHAH SIMNAN HAJJ KAFELA TOURS & TRAVELS
৬নং মদিনা মার্কেট, (৪র্থ তলা) হাটহাজারী রোড, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।
ফোন ০৩১-৬৫০০৭৮ মোবাইল : ০১৮১৭-৭৫৪৬৩৪, ০১৮১৭-২০৬৫৪৪
E-mail: shahsimnanhajjkafela@gmail.com

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ
সম্মানিত হজ্বযাত্রী ভাই ও বোনেরা !

হজ্ব ইসলামের পাঁচটি রুকন এর মধ্যে একটি। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন, "সামর্থবানদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বাইতুল্লাহর হজ্ব ফরজ করেছেন"। অন্যত্র ঘোষণা করেন "তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হজ্ব ও ওমরাহ পালন কর"। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "হজ্বের প্রতিদান কেবলমাত্র বেহেস্তই"। দলবদ্ধভাবে হজ্ব আদায় করা সুন্নাত। আমরা জানি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব ফরজ হওয়ার পর সর্বপ্রথম ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে একদল সাহাবাকে হজ্বে প্রেরণ করেন। বিদায় হজ্বের সময়ও মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে লক্ষাধিক সাহাবীদের এক বিরাট দল হজ্ব পালন করেন। একাকী সফর করতে হুযুর কারিম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। হুযুর কারিম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা আরো এরশাদ করেন, তোমরা একাকী সফর করোনা। যদি কেউ একাকী সফর করে তবে শয়তান তার সফরসঙ্গী হয়, যদি দুইজন সফর করে তবে তৃতীয় সঙ্গী হয় শয়তান, পক্ষান্তরে তিনজন (নূন্যতম) সফর করলে সে দল শয়তানের প্রভাব মুক্ত হয়।

তাই হজ্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দলভূক্ত হওয়া গুরুত্বহ। বাংলাদেশ হতে অনেক হজ্ব এজেন্সী হজ্বের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মুত্তাকী আলেমেদ্বীন রাসুল প্রেমিকের সাহচর্য এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্বহ। হজ্বের মাসআলা-মাসায়েল, ফরজ-ওয়াজিব, সুন্নাত-মুস্তাহাব ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী সঠিকভাবে জানা না থাকলে হজ্বই আদায় হবে না।

সেজন্যেই যোগ্য, অভিজ্ঞ আলেম ও মোয়াল্লেমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে হজ্বের হুকুম আহকাম আদায় করা বাঞ্চনীয়। শাহ সিমনান হজ্ব কাফেলা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস হাজ্বীদের আন্তরিক সেবাদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অশেষ মেহেরবানীতে হাজী সাহেবদের সার্বক্ষণিক সেবা দানের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্ব আদায় করে প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসার ব্যবস্থা করে থাকে। শাহ সিমনান হজ্ব কাফেলা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস সম্মানিত হাজী সাহেবদের হজ্ব পালন, মক্কা-মদীনা শরীফের জিয়ারত ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ জেয়ারতের সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশের হক্কানী আলেম ও মোয়াল্লিমগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই কাফেলা পরিচালিত হয়ে আসছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বিশুদ্ধভাবে হজ্ব আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমিন!